বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি

২০১৮

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি ২০১৮

Diakonia
People Change the World

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০১৮

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৯

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2018

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
14/23 Babor Road (4th floor), Block B
Mohammadpur, Dhaka 1207
Tel: +88 02 9119903-4
Mobile: +88 01974 666890
Email: info@safetyandrights.org
Web: www.safetyandrights.org

Date of Publication
January 2019

Price : 100 Tk.

Copyright : Safety and Rights Society (SRS)

ISBN : 978-984-34-5687-8

সূচি

	সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য	৫
১.	শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০১৮: একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র	৭
২.	অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিল	১২
৩.	পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন এবং মজুরি বৃদ্ধি	১৫
৪.	‘শ্রমিকের পৃথক কিছু স্বার্থ আছে, যা মালিকের স্বার্থ থেকে আলাদা’	১৮
৫.	‘চামড়া শিল্পনগরী’তে শ্রমিকদের দুর্দশা অব্যাহত: এবার দূষিত হচ্ছে সাভারের নদী	২১
৬.	এখন ‘মালিকদের যুগ’ যাচ্ছে	২২
৭.	শ্রমমজুরি নিয়ে আইএলও-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদন: প্রকৃত মজুরি বাড়ছে সামান্যই	২৫
৮.	‘বাজেট ২০১৮’ থেকে শ্রমজীবীরা কী পেল	২৬
৯.	বাংলাদেশে বিদেশী কর্মজীবীদের উপস্থিতি বাড়ছে	২৯
১০.	‘সকলের জন্য পেনশন’: প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ২০১৮ সালেও; তবে এ বছর শুরু হতে পারে	৩১
১১.	দেশজুড়ে প্রায় ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে	৩৩
১২.	চা খাতে নতুন মজুরি কাঠামো এবং নতুন সিবিএ নির্বাচন হলো	৩৫
১৩.	মন্ত্রিসভায় শ্রম আইনের সংশোধন অনুমোদন; শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ	৩৮
১৪.	‘গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নীতিমালা’ বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি; নির্যাতন কমছে না	৪১
১৫.	সৌদি আরব থেকে নারী শ্রমিকদের ফেরত আসা বেড়েছে	৪৩
১৬.	পাথরভাঙ্গা শ্রমিক: সিলিকোসিসের অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলছে না	৪৫
১৭.	‘২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩২ হাজার প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা ছিল’	৪৭
১৮.	শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অর্থ আরও অধিক হারে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের দাবি	৪৯
১৯.	সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের সমস্যার সুরাহা হয়নি; তবে নিহত ও অক্ষম জেলেদের জন্য প্রণোদনার উদ্যোগ	৫১
২০.	বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধার তদন্ত চায়: আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রম অধিকার সংগঠন	৫৩
২১.	রানাপ্লাজা ধসের পাঁচ বছর পূর্তি: তাজরীন অগ্নিকান্ডের ছয় বছর পূর্তি	৫৪
২২.	ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাড়লেও অনুমোদন প্রত্যাশা মতো বাড়ছে না	৫৬
২৩.	কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত চিত্র	৫৮
২৪.	নির্মাণ খাতে এখনও শ্রমিকরা দু’জন ‘মালিক’-এর জন্য খাটেন	৬১
২৫.	Brief of Labour Rights and Labour Economy in 2018	৬৩

সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বক্তব্য

শ্রম খাতে মালিক-শ্রমিক-সরকার মিলে ত্রিপক্ষীয় সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন

গত বছরের মতো এবারও সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি দেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি বিষয়ে তার বাৎসরিক সংকলনটি প্রকাশ করছে। গত বছরও যেমনটি বলা হয়েছে, আমাদের এই প্রকাশনা কোন গবেষণা দলিল নয়– তবে একই সঙ্গে এও বলা উচিত যে এটা কেবল কিছু তথ্য-উপাত্তের সংকলন মাত্রও নয়। এই প্রকাশনার মধ্যদিয়ে সেইফটি এন্ড রাইটস মূলত দেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি এবং শ্রম অর্থনীতির গতিশীলতার চুম্বক ইঙ্গিতটি দিয়ে যেতে চায়। এখানে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তগুলো মূলত আমরা সংকলন করি বিগত বছরের জাতীয় প্রচার মাধ্যম থেকে। জাতীয়ভাবে সুপরিচিত ও নেতৃস্থানীয় পত্রিকাগুলো থেকে।

অনেকেই জানেন হয়তো সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি কাজ করে প্রধানত দেশের শ্রমজীবীদের অধিকার বিষয়ে। বিশেষ করে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান গত প্রায় এক দশক ধরে। শ্রম বিষয়ে গবেষণা, শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা, শ্রমিকদের মাঝে পেশাগত স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা, শ্রমখাতের দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে তথ্য সংকলন, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং শ্রমিক স্বার্থে বর্ধিত জাতীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য জাতীয় পরিসরে প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি সেইফটি এন্ড রাইটস-এর একটি অন্যতম উদ্যোগ হলো শ্রম অধিকার ও শ্রম অর্থনীতি বিষয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ। প্রতি বছর জানুয়ারিতে পূর্ববর্তী বছরের পরিস্থিতির ওপর এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মূলত দেশের শ্রম অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাই এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে থাকে।

গত বছর আমাদের প্রতিবেদনের মূল থিম ছিল কর্মসংস্থান প্রশ্ন। এবার আমাদের এই বর্ষপত্রের মূল ফোকাস থাকছে মজুরি প্রশ্ন এবং শ্রম আইনের সংশোধনকে ঘিরে। ২০১৮ সালে মজুরি ও আইনগত বিষয় নিয়েই প্রধানত শ্রম খাতের আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রিভূত ছিল। এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও অনেকগুলো প্রতিবেদন স্বতন্ত্র ও সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি প্রধান খাতগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী চিত্র তুলে ধরতে। সে কারণে কয়েকজন শ্রমিক সংগঠকের সাক্ষাৎকারও যুক্ত করা হয়েছে প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে।

> বাংলাদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠী প্রায় ছয় কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে দারোয়ান, হকার, ফেরিওয়ালা, গৃহকর্মী, গাড়িচালক ও সহযোগী, নির্মাণ শ্রমিকের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। বাকিরা আছেন আনুষ্ঠানিক খাতে।

প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শিল্প খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতে এইরূপ বাৎসরিক প্রতিবেদনে শ্রমশক্তি ও শ্রম অর্থনীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয় এবং অন্যান্য শিল্পখাতের ওপরও বিস্তারিত মনযোগ দেয়া হবে বলে সেইফটি এন্ড রাইটস ইচ্ছা পোষন করছে।

বিভিন্ন গবেষণাসূত্রে এটা অনুমান করা হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠী প্রায় ছয় কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে দারোয়ান, হকার, ফেরিওয়ালা,

> আনুষ্ঠানিক খাতের বড় বড়গুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম এখনও সীমিত। ফলে সমগ্র কর্মজীবীদের অতি নগণ্য সংখ্যকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রয়েছে দেশে।

গৃহকর্মী, গাড়িচালক ও সহযোগী, নির্মাণ শ্রমিকের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। বাকিরা আছেন আনুষ্ঠানিক খাতে।

যদিও গত বছরও অনেক আইনগত সংস্কার সাধিত হয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক খাতের বড় বড়গুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম এখনও সীমিত। ফলে সমগ্র কর্মজীবীদের অতি নগণ্য সংখ্যকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রয়েছে দেশে। এইরূপ পরিস্থিতিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ধরন থেকে আধুনিক শিল্প-অর্থনীতির ধারায় স্থাপন করা গেছে সামান্যই। শিল্প পরিসরে টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মালিক-শ্রমিক-সরকার মিলে যে একটি ত্রিপক্ষীয় সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন এই বোধ এখনও বাংলাদেশের শ্রম অর্থনীতিতে খুবই দুর্বল। যার ফলে শ্রম অধিকারমূলক পরিস্থিতিতে এক ধাপ এগিয়ে প্রায়ই দুই ধাপ পিছিয়ে যেতে হয়। যা দেশের শিল্প পরিবেশের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়।

চারিদিকে তাকালেই আমরা দেখি, পেশাগত স্বাস্থ্য, মজুরি, নিরাপত্তা, সংগঠিত হওয়ার অধিকারের দুর্বলতার মাঝে শ্রমজীবীর জীবন খুবই নাজুক এবং তার প্রবল ছাপ ছড়িয়ে আছে সমাজের সর্বত্র; বিশেষভাবে শ্রম অর্থনীতিতে।

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি এই পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। এই প্রকাশনাও সেই লক্ষ্যেই প্রকাশিত। আমরা আশা করবো আসন্ন দিনগুলোতে বাৎসরিক শ্রমচিত্র আরও ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় ভরে উঠবে। যা বাংলাদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবীর পাশাপাশি দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তির জন্যও জরুরি। এই প্রকাশনার উন্নয়নে কেউ মতামত দিয়ে সহায়তা করলে আমরা খুশী হবো।

মো. সেকেন্দার আলী মিনা
নির্বাহী পরিচালক
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

১

শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০১৮: একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

- **শ্রম আইনে সংশোধন**
- **বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতে নতুন মজুরি কাঠামোর ঘোষণা**
- **প্রবাসী আয়ে কর বসেনি; প্রবাসী নারী শ্রমিকের ফিরে আসা বেড়েছে**
- **শিল্প দুর্ঘটনা বেড়েছে**
- **দক্ষ কর্মীর সংকট**
- **আরও তিনটি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা; ১৭ হাজার মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায়**

শ্রমখাতের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মতামতকে বিবেচনায় নেয়ার ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে ২০১৮ সালের বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছর শ্রম আইনে সংশোধনী এসেছে। অক্টোবরে এইরূপ সংশোধনী মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। যদিও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সংশোধনীগুলোকে অপর্যাপ্ত হিসেবে অভিহিত করেছে। ডিসেম্বরে সরকার ইপিজেড শ্রম আইনের খসড়াও মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করে।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদনে শীতল প্রতিক্রিয়া

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন এবছরও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদনের প্রতি পূর্বের মতো বিরূপ মনোভাব অব্যাহত ছিল। রাজধানী ঢাকায় পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাতিলের হার কিছুটা কমলেও চট্টগ্রামে ছিল বিপরীত চিত্র। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাতিলের হার বাড়ছিল।

২০১৮-এর ১৭ মার্চ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর তথ্য উদ্বৃত করে দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, দেশে মাত্র ৩ শতাংশ পোশাক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এর বাইরে যদিও অনেক কারখানায় 'ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন কমিটি' রয়েছে– তবে তা নির্বাচিত নয়।

এ বছর গ্রামীণ ফোন, শেভরণসহ বহুজাতিক অনেক সংস্থার বাংলাদেশ অফিস থেকে অনেক কর্মী ছাটাই করা হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রতিকার না পেয়ে ছাটাইকৃতরা মিছিল সমাবেশ করেছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের জোট 'অ্যাকর্ড' ও 'অ্যালায়েন্স'-এর কার্যক্রম বিষয়ে পোশাক মালিক এবং নীতিনির্ধারকদের একাংশের রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও উভয় সংস্থার সংস্কারমূলক কর্মসূচিসমূহ এ বছরও চলতে দেয়া হয়।

জনসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে ঘাটতি এ বছরও লক্ষ্য করা যায়। ফলে পোশাকসহ অনেক খাতে বিদেশ নির্ভরতা বাড়ছিল। এ বছর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের এক যৌথ সমীক্ষায় দেখানো হয়, দেশে কৃষিজাত পণ্যে সার্বিকভাবে ৭৬ শতাংশ দক্ষ কর্মীর সংকট রয়েছে। নির্মাণ খাতে দুই লাখ অভিজ্ঞ কর্মীর সংকট রয়েছে। পাশাপাশি এ বছর আইএলও-এর প্রতিবেদনে দেখা যায় উচ্চ শিক্ষিতদের বেকারত্বে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পার হয়নি এমন মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার কম (১ দশমিক ৮ শতাংশ)- কিন্তু উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। সিপিডি ৯ মে এক গবেষণা ফল তুলে ধরে জানায়, সর্বশেষ চার বছরের ব্যবধানে (২০১৩-২০১৭) শিল্পখাতে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে সাড়ে আট লাখ। ২০১৩ সালে যা ছিল ৩৯ লাখ ৯০ হাজার, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তা হয়েছে ৩১ লাখ। তবে একই সময়ে কৃষি ও সেবা খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রমের জন্য নতুন আইন

শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা এ বছরও অব্যাহত ছিল। ২০১৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১২ বছরে এ খাতে ১৮১ জন শ্রমিক বিভিন্ন 'দুর্ঘটনা'য় মারা যায়। ২০১৭ সালে মারা যায় ১৭ জন। ২০১৮ সালেও এইরূপ মৃত্যুর ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। এ বছর জানুয়ারিতে প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে সিতাকুন্ডের প্রিমিয়াম ট্রেড কর্পোরেশন এবং আরএ শিপইয়ার্ডে। দুজন মারা যায় এই দুই স্থানে। ২০১৮ সালে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮। উল্লেখ্য, বিশ্বে যত পুরানো জাহাজ ভাঙ্গা হয় তার চারভাগের একভাগ বাংলাদেশে হচ্ছে।

তবে একই সময়ে এ বছর শিপব্রেকিং বিষয়ে সংসদে আইন পাস হয়। 'বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং বিল ২০১৮' নামের এই আইনে বলা হয়েছে, ইয়ার্ডগুলোতে সকল কর্মজীবীর জীবনবীমা সুরক্ষা থাকতে হবে। মালিকদেরই তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র ছাড়া ভাঙ্গার জন্য কোন জাহাজ বাংলাদেশের উপকূলে আনাকেও আইনে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। এই আইনে এও বলা হয়, সরকার আগামী তিন বছরের মধ্যে জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রম থেকে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পৃথক একটি আইন তৈরি করবে।

জাহাজ ভাঙা শ্রমিকরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে, তাদের কর্মস্থলে বেশির ভাগ মালিক তাদের সুরক্ষা সামগ্রী দিতে অবহেলা করেন। সুরক্ষা উপকরণ হিসেবে হেলমেট, সেফটি জ্যাকেট, বুট ব্যবহার করার কথা থাকলেও ইয়ার্ডগুলোয় এসবের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। ইয়ার্ড শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের অভিযোগ, মালিকরা জাহাজ ভাঙার কাজ দেন প্রথমত ঠিকাদারকে। দ্রুত জাহাজ ভাঙতে শ্রমিকদের চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেন ঠিকাদাররা। ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহারে অনেক সময় কাজের গতি শ্লথ হয়ে যায়– এ কারণে ঠিকাদাররা সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারে শ্রমিকদের নিরুৎসাহিত করে। তবে উপকরণ যে আছে সেটা প্রায় ইয়ার্ডেই দেখা যায়। কিন্তু এগুলোর ব্যবহার দেখা যায় না।

আইন অনুযায়ী ঠিকাদারদের সরকারি অনুমোদন থাকার কথা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ঠিকাদারই অনুমোদিত নয়।

পোশাক খাতসহ বিভিন্ন খাতে নতুন মজুরি

এবছর পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ব্যতীত বড় আকারে কোন শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়নি। শ্রমিক সংগঠকদের ওপর দমনপীড়নও অন্যান্য বছরের চেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে কম ছিল। পোশাক শ্রমিক সংগঠনগুলো বরাবর ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন করলেও সে দাবি পূরণ হয়নি। তবে এই খাতে নতুন একটা মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয়েছে অক্টোবরে এসে– যদিও মজুরিবোর্ড গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় জানুয়ারিতে। নতুন মজুরি ঘোষণায় অসন্তুষ্ট হয়ে পোশাক খাতের শ্রমিকরা তারপরও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। ডিসেম্বরে সাভার-আশুলিয়ায় এই আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে। তবে জাতীয় নির্বাচন এসে পড়ায় সেই আন্দোলন দানা বাঁধেনি।

যদিও পোশাক শ্রমিকদের মজুরি প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়েনি– তবে এই খাতের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ঘটছিল প্রায় ১০ শতাংশ হারে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের রপ্তানির হিসাব থেকে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৯ দশমিক ১১ শতাংশ। অথচ বরাবরের মতোই দেশের বড় উৎসব ঈদের আগে প্রতিশ্রুতি মতো (২০ রমযানের মধ্যে) পোশাক শ্রমিকদের উৎসব ভাতা না দেয়ার অভিযোগ ওঠে এবছরও। আবার অনেক কারখানায় যে বোনাস দেয়া হয় তা নিয়মানুযায়ী মূল বেতনের সমপরিমাণ ছিল না।

২০১৮-এর মার্চে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' সংস্থা তাদের এক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানায় যে, দেশের পোশাক তৈরির কারখানাগুলোতে ৭২ ভাগ শ্রমিকই নিয়োগপত্র ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে। পোশাকের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত চামড়া শিল্পে এই বছরও স্থানান্তরজনিত শ্রমিক দুর্দশা অব্যহত ছিল।

নতুন মজুরি ঘোষণা

এ বছর চা, চামড়া, বেকারি, এলুমিনিয়াম ও এনামেলসহ আরও কয়েকটি খাতের নতুন মজুরি প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এর মধ্যে চা খাতেও পোশাক শিল্পের মতোই নতুন মজুরি ঘোষণায় শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা যায়। বকেয়া মজুরি দেয়া হয়ে প্রলম্বিত সময় ধরে। ফলে 'প্রকৃত মজুরি'

কমে যায়। ন্যায্য মজুরি আদায়ের ক্ষেত্রে চা শ্রমিক সংগঠনগুলোর দুর্বলতা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে এই বছর। তারা চেয়েছিল দৈনিক ২৩০ টাকা, পেয়েছে ১০২ টাকা করে।

দুর্ঘটনা প্রবণ সড়ক খাত: নতুন আইন

এবছর সড়ক নিরাপত্তা ছিল জনসমাজে অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি এবং পরিবহন শ্রমিকদের নৈরাজ্যকর ভূমিকা অব্যাহত ছিল। সরকার দুর্ঘটনা রোধে পরিবহন শ্রমিকদের দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। সর্বোচ্চ সাজা পাঁচ বছর ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা এবং সেপ্টেম্বরে তা সংসদে অনুমোদিত হয়। নতুন আইন অনুযায়ী, বেপরোয়াভাবে বা অবহেলা করে গাড়ি চালানোর কারণে কেউ গুরুতর আহত বা নিহত হলে দন্ডবিধির ৩০৪ (খ) ধারায় মামলা দায়ের হবে। এই ধারায় সাজা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড এবং সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা। তবে গাড়ি চালানোর কারণে কারো নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে 'হত্যা' বলে প্রমাণিত হলে ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদন্ডের বিধান প্রয়োগ হবে।

এই আইন নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যাপক মতদ্বৈততাও লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ছিল সড়ক দুর্ঘটনার সব মামলা জামিনযোগ্য করা, দুর্ঘটনায় চালকের পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান বাতিল, চালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণির পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত করা, ৩০২ ধারার মামলার তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখা, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা ইত্যাদি। এ বছর পরিবহন শ্রমিকরা হাইওয়েতে চাঁদাবাজি বন্ধে বিভিন্ন সময় সভা করেছে। তবে তাতে জনসমর্থন লক্ষ্য করা যায়নি।

শিল্প দুর্ঘটনা কমছে না, হত্যার বিচার হচ্ছে না

এবছর শিল্প দুর্ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। তবে পোশাক খাতে দুর্ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। জাহাজভাঙ্গা শিল্প, নির্মাণ খাত ইত্যাদি পরিসরে দুর্ঘটনার ধারা পূর্বের মতো অব্যাহত ছিল। নির্মাণ খাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম আইনের কোন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। ২০১৭ সালের মতোই ২০১৮ সালেও দেশের প্রধান এক দুর্ঘটনাপ্রবণ খাত হিসেবে চিহ্নিত ছিল নির্মাণ শিল্প। ২০১৮ সালের প্রথম

১২ মাসে ৫৫ হাজার নারী কর্মী বিদেশে

২০১৮ সালের ১৮ জুন তৎকালীন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম জাতীয় সংসদে জানিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী ১২ মাসে ৫৫ হাজার ১৪৯ জন নারীকর্মী বিদেশ গেছেন। এ সময়ে বিভিন্ন সমস্যার কারণে ফেরত আসা কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৬৯ জন। জাতীয় সংসদে সদস্য সেলিম উদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান।

সংসদ সদস্য সানজিদা খানমের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ১৬৫টি দেশে কর্মী পাঠানো হচ্ছে। ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন কর্মী পাঠানো হয়। ২০১৮ সালের মে পর্যন্ত ৩ লাখ ৪৭ হাজার ২৭ জন কর্মী পাঠানো হয়েছে। বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৮-এর ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন দেশে ৩০ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪৮ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে।

নিজাম উদ্দিন হাজারীর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন, বিভিন্ন দেশে ৫ হাজার ৩৫ জন বাংলাদেশি কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আটক রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌদি আরবের কারাগারে রয়েছেন ৯৭৬ জন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮৫১ জন, মালয়েশিয়ায় ৮১০ জন, ওমানে ৪৭৮ জন, জর্ডানে ৮৫ জন, লিবিয়ায় ২৯ জন, থাইল্যান্ডে ৫ জন, মরিশাস ৬ জন, সিঙ্গাপুরে ৮৭ জন, জাপানে ২৭ জন, ইতালিতে ১৩৭ জন, হংকংয়ে ৯১ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৩ জন, ইরাকে ৯৭ জন, কুয়েতে ৩৮৪ জন, গ্রিসে ১৪৬ জন, বাহরাইনে ৪৩৮ জন, ব্রুনাইয়ে ১০ জন, মালদ্বীপে ১১৩ জন, মিসরে ৪ জন এবং কাতারে ২৩৮ জন বাংলাদেশি কর্মী কারাবন্দী রয়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃতদের সংখ্যা বাড়ছেই

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর এই ১১ মাসে দেশে ৫৭০ জন শ্রমজীবী কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ১৫টি জাতীয় এবং ১১টি আঞ্চলিক সংবাদপত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে এই চিত্র পাওয়া গেছে। নিহতের পাশাপাশি একই সময়ে ৪৬২টি দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষ আহতও হয়েছে। সেইফটি এন্ড রাইটস এর অনুসন্ধানে এই চিত্র পাওয়া যায়।

হিসাবে দেখা গেছে, আহত ও নিহতের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরগুলোর একই সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ২০১৭ সালের প্রথম ১১ মাসে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ৪০৫ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে মারা গিয়েছিলেন ৩৮৩ জন এবং ২০১৫ সালে ৩৭৩ জন।

বলা বাহুল্য যে, এই সংখ্যা কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে নেয়া। দুর্ঘটনায় মৃত ও আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা দেশব্যাপী অবশ্যই আরও অনেক বেশি হবে।

এ বছরের দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন নির্মাণ খাতে। মোট মৃতদের ৩২ শতাংশই (১৮০ জন) নির্মাণ খাতের। এই খাতের অন্তত ১৪৬টি দুর্ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালের প্রথম এগারো মাসে। ২৭ শতাংশ মৃত্যু হচ্ছে সড়ক পরিবহন খাতে। ১১ মাসে এখাতে ১৫৬ জন মারা গেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শ্রমজীবী মানুষের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৩০ বছরের কম বয়সীদের আধিক্য ছিল। প্রায় ৩৮ শতাংশ মৃতই ছিল ঐ বয়সী। অন্যদিকে মৃতদের মধ্যে বার জন ছিলেন নারী। সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন মে মাসে–১০৯ জন। জেলার মধ্যে ঢাকা, সিলেট ও নারায়নগঞ্জে সর্বোচ্চ শ্রমজীবী মানুষ মারা গেছে।

১১ মাসে দেশে ৫৭০ জন কর্মজীবী কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। নিহতের এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরগুলোর একই সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ২০১৭ সালের প্রথম ১১ মাসে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ৪০৫ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন। নির্মাণ ও সড়কে সবচেয়ে বেশি কর্মজীবী মানুষ মারা গেছে।

এবছর সাভারের রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পাঁচ বছর পূর্তি হলেও দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো তখনও নিষ্পত্তি হয়নি। একইভাবে তাজরীন কারখানা দুর্ঘটনার ছয় বছর হলেও সেখানেও অভিযুক্তদের বিচার হয়নি।

সাংবাদিকদের উপর হামলাও বছরজুড়ে অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন প্রেসক্লাবের সদস্যরা প্রায়ই এসব হামলার বিরুদ্ধে মানববন্ধনে শামিল হয়। জানুয়ারিতে সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার কর্মীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠন করা হয় নবম ওয়েজ বোর্ড। এর প্রায় সাত মাস পর সেপ্টেম্বরে মজুরি বোর্ড তার ঘোষণায় সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার কর্মীদের জন্য মূল বেতনের ৪৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ করে। যা ২০১৮ সালের ১ মার্চ থেকে কার্যকর ধরা হয়েছে।

প্রবাসী নারী শ্রমিকদের ফিরে আসা বেড়েছে

প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে নারী প্রবাসী শ্রমিকদের হয়রানি শেষে দেশে ফেরার ঘটনা ঘটেছে বছরজুড়ে বিভিন্ন সময়। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সূত্রে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০১৮ সালে প্রায় সাত লাখ ৩৫ হাজার নারী শ্রমিক কর্মরত ছিল। এর মধ্যে সৌদি আরবে আছে প্রায় এক তৃতীয়াংশ। হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে আসার ঘটনাও বেশি সেখান থেকেই। এ বছর বাজেটকালে প্রবাসী আয়ে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আরোপের কথা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও আদতে সরকার তা করেনি।

অন্যদিকে, শ্রমবাজারে বিদেশীদের উপস্থিতি হার ক্রমে বাড়ছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবছর। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বলেছেন, বৈধভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আয়-রোজগার করছেন অন্তত ৮৫ হাজার ৪৮৬ জন বিদেশি। তারা অন্তত ৩৩ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ১৬

ক্যাটাগরিতে কাজ করছে। বৈধ বিদেশীদের মাঝে বিশ্বের অন্তত ৪৪টি দেশের মানুষ পাওয়া গেছে।

সর্বজনীন পেনশনের বিষয় আলোর মুখ দেখেনি

সর্বজনীন পেনশনের বিষয়টি ২০১৮ সালেও আলোর মুখ দেখেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী বছর শেষে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, এ বিষয়ে সরকার কাজ করছে। এই আশ্বাসের আলোকে আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালে বেসরকারি খাতের বিভিন্ন পরিসরে সর্বজনীন পেনশনের আওতা সম্প্রসারিত করতে সরকার পদক্ষেপ নেবে।

এ বছর এই মর্মেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, মৎস্যজীবীদের মধ্যে যারা দুর্যোগ বা জলদস্যু বা কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে নিহত বা আহত হচ্ছে তাদের পরিবারের জন্য সরকার আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে নীতিমালা তৈরি করছে।

শ্রম আদালত ও আপীল ট্রাইব্যুনালে ১৭ হাজার মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায়

২০১৮ সালের মাঝামাঝি (২৬ আগস্ট) সরকার আরও তিনটি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। বরিশাল, রংপুর ও সিলেট- এই তিন শহরের শ্রম আদালতগুলো প্রতিষ্ঠা হবে। সরকারের সচিব কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়।

বর্তমানে দেশে সাতটি শ্রম আদালত আছে। এরমধ্যে ঢাকায় তিনটি, চট্টগ্রামে দুটি এবং খুলনা ও রাজশাহীতে একটি করে শ্রম আদালত রয়েছে। এসব আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার জন্য রয়েছে একটি শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল। এটি ঢাকায় অবস্থিত। সচিব কমিটির সভা শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান প্রচার মাধ্যমকে জানান, তিনটি শ্রম আদালতের প্রতিটির জন্য একজন চেয়ারম্যানসহ ১৪ জন করে মোট ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরও দেশের চারটি বিভাগে এখনও শ্রম আদালত নেই এবং আপীল ট্রাইব্যুনালও মাত্র একটি। শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন আছে ২০১৮ এর মার্চের হিসাবে প্রায় ১৭ হাজার।

স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরও দেশের চারটি বিভাগে এখনও শ্রম আদালত নেই এবং আপীল ট্রাইব্যুনালও মাত্র একটি। শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন আছে ২০১৮ এর মার্চের হিসাবে প্রায় ১৭ হাজার।

ইপিজেড শ্রম আইনের খসড়া অনুমোদন

২০১৮-এর ৩ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা ইপিজেড শ্রম আইনের খসড়া অনুমোদন দেয়। আগে যেখানে ইপিজেডে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি করার জন্য ৩০ শতাংশ শ্রমিকের প্রয়োজন হতো নতুন খসড়ায় তাকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ক্ষেত্রেও তিন চতুর্থাংশের বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে।

২

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিল

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানাপ্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। পাঁচ বছরের জন্য গঠিত এই কার্যক্রমের মেয়াদ ২০১৮ সালে শেষ হওয়ার কথা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত অ্যাকর্ডের সদস্য ১ হাজার ৬২০ কারখানার ত্রুটি সংস্কার কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয় এবং অ্যালায়েন্সের ৬৬৪ কারখানার ত্রুটি সংস্কার কাজও প্রায় অনুরূপ হারে শেষ হয়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। তবে ২০১৯-এও অনুরূপ কার্যক্রম কীভাবে অব্যাহত থাকবে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়নি।

বাংলাদেশে ইউরোপভিত্তিক ক্রেতাদের সমন্বয়ে গঠিত কারখানা পরিদর্শন জোট 'অ্যাকর্ড'-এর উপস্থিতি এবং কার্যক্রম নিয়ে বিগত বছর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা-বিতর্ক-অভিযোগ-সংহতি অব্যাহত ছিল। ২০১৮-এর মে মাসে বিজিএমইএ এবং অ্যাকর্ড (অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ) এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে শেষোক্ত জোটের কার্যক্রম আর ছয় মাস বৃদ্ধির কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানায়। কিন্তু এসময় দেশের উচ্চ আদালত আবার এইরূপ কার্যক্রমে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আদালত একই সঙ্গে এ বিষয়ে অ্যাকর্ডের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নতুন কোন চুক্তিতে আসার প্রশ্নেও নিষেধাজ্ঞা দেয়। এইরূপ বিপরীতমুখী অবস্থার কারণে অ্যাকর্ডের পরিদর্শন ব্যবস্থা জটিল এক পরিস্থিতি পার করে বছরের ঐ সময়।

মে মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অ্যাকর্ডের সময়সীমা আরও ছয়মাস বৃদ্ধির ঘোষণার সময় আশা করা হয় যে, এই সময়ের মধ্যে সরকার গঠিত 'সংস্কার সমন্বয় সেল' বা আরসিসি তার পরিদর্শন দক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু ইত্যবসরে স্মার্ট গ্রুপ নামে একটি প্রতিষ্ঠান অ্যাকর্ডের কাজের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে রিট করে। ফলে জোটের পরিদর্শন কাজ যেমন বন্ধ হয়ে যায় তেমনি স্বাভাবিকভাবে তার কাছ থেকে আরসিসিকর্তৃক পরিদর্শন সম্পর্কিত দায়িত্ব বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রেও তৈরি হয় অনির্দিষ্টকালের অনিশ্চয়তা।

আরসিসি প্রস্তুত; কারখানা হস্তান্তর অব্যাহত ছিল

আরসিসি হলো শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস বিভাগ, রাজউক, গণপূর্ত বিভাগসহ পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। যা স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পোশাক খাতের অবকাঠামোগত মানোন্নয়নে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স (অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি)-এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করার কথা রয়েছে। ২০১৮ সালের শেষার্ধে আরসিসি'র কাছে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শন ও সংস্কার বিষয়ক নজরদারির জন্য ২০টি কারখানা হস্তান্তর করে এবং আরও ৮০টি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন ছিল বলে জানা যায়।

তবে ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায়, পোশাক খাতে অনেকেই অ্যাকর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। দেশের প্রচার মাধ্যমেও প্রতিনিয়ত অ্যাকর্ড নিয়ে নেতিবাচক প্রতিবেদন ও মতামত ব্যক্ত হচ্ছিলো। কিন্তু সরেজমিন বাস্তবতা ছিল অ্যাকর্ডের পরিদর্শন কাজ নির্ভরযোগ্যভাবে বুঝে নেয়ার মতো যথেষ্ট সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য গড়ে তোলা তখনও বাংলাদেশের জন্য বাকি ছিল। যা পোশাক খাতের বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য জরুরি।

২০১৮ সালের ১০ মে বিজিএমইএ এক সংবাদ সম্মেলনে আরসিসি'র প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষতার বাস্তবতা স্বীকার করে। সেখানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে যেয়ে বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, পোশাক শিল্পের ইতিহাসে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়। এ দুর্ঘটনায় অনেক মূল্যবান প্রাণ ঝরে পড়েছিলো। তবে এই দুর্ঘটনাটি ছিল সকলের জন্য একটি ওয়েক-আপ কল। এ দুর্ঘটনার পর পরই শোককে শক্তিতে পরিণত করে শিল্পে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সকলে উদ্যোগী হয়েছে। অ্যাকর্ড বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের নিরাপত্তা মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কীভাবে ফায়ার ডোর লাগাতে হয়, কীভাবে স্প্রিংকলার লাগাতে হয়, কী ধরনের ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হয়–এসব বিষয়ে বাংলাদেশে জানাশোনার ঘাটতি ছিল। এগুলো আমরা শিখেছি। অ্যাকর্ড বাংলাদেশের পরম বন্ধু হিসেবেই কাজ করেছে। সিদ্দিকুর রহমান বলেন, অ্যাকর্ড বাংলাদেশের পোশাক খাতে নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করার জন্য ৫ বছর মেয়াদের ঘোষণা দিয়ে কাজ শুরু করেছিলো যার মেয়াদ ২০১৮ সালের মে মাসে শেষ হয়। তবে তাদের কাজ বুঝে নেয়ার জন্য বর্তমানে ডিআইএফই (কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর)-এর প্রস্তুতির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার আরও ৬ মাসের জন্য এদেশে তাদের মেয়াদ বর্ধিত করেছে। এই ছয় মাস কার্যক্রম চালানোর জন্য সরকার সম্প্রতি অন্তরবর্তীকালীন তদারকি কমিটি (টিএমসি) গঠন করেছে। এতে সরকার, ব্র্যান্ড, শ্রমিক প্রতিনিধি, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধি রয়েছে।

এই সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটির দুই সদস্য ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সহকারী মহাসচিব জেনি হোল্ডক্রফট ও এলসি ওয়াইকিকির প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা এডওয়ার্ড সাউথহল। বিজিএমইএর পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ফারুক হাসান ও মাহমুদুল হাসান খান বাবু, অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য এইচঅ্যান্ডএমের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কার্ল গার্নার ফার্গলিন, শ্রমিকনেতা রায় রমেশ চন্দ্র, আমিরুল হক আমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অ্যাকর্ডের পক্ষে এডওয়ার্ড সাউথহল বলেন, অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার সম্মতি দিয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাকর্ডের কার্যক্রম বুঝে নিতে জাতীয় সংস্থাকে কারখানা পরিদর্শন করার সক্ষমতা, নিরাপত্তা ঝুঁকি সংশোধন, নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, ত্রুটি সংশোধন কাজ ও পরিচালনা স্বচ্ছ এবং শ্রমিকের নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগ সম্পর্কে সঠিক তদন্ত করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

> শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, আরসিসিকে শক্তিশালী করার জন্য এর মধ্যে সরকার ৬০ জন প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। পর্যায়ক্রম বাকি নিয়োগ সম্পন্ন করার পর সব মিলিয়ে ১৩০ জন প্রকৌশলী আরসিসিতেই স্থায়ীভাবে কাজ করবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। পুরো জনবল, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সরকারের সব ধরনের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করলে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের চেয়েও এটি (আরসিসি) ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।

এক প্রশ্নের জবাবে এডওয়ার্ড সাউথহল বলেন, আরসিসি অ্যাকর্ডের কার্যক্রম বুঝে নিতে এখনো প্রস্তুত নয়। আরসিসি সবদিক থেকে যোগ্য হয়ে ওঠার পরই অ্যাকর্ড তার কার্যক্রম গোটাবে। সে ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদে অ্যাকর্ডের কার্যক্রম বাড়তে পারে। অন্যদিকে, অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, সরকার অ্যাকর্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। ফলে আদালতের বিষয়টি সরকার দেখবে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। পাঁচ বছরের জন্য গঠিত এই কার্যক্রমের মেয়াদ ২০১৮ সালে শেষ হওয়ার কথা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত অ্যাকর্ডের সদস্য ১ হাজার ৬২০ পোশাক কারখানার ত্রুটি সংস্কার কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। অন্যদিকে অ্যালায়েন্সের ৬৬৪ কারখানার ত্রুটি সংস্কারকাজও প্রায় অনুরূপ হারে এগিয়েছে এবং উভয় সংস্থার এইরূপ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

আদালতের নতুন নির্দেশনা

বছরের প্রথমার্ধে এক দফা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে অ্যাকর্ডের কার্যক্রম আরো ছয় মাস চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় হাইকোর্ট। মে মাসের শেষ দিন এ-সংক্রান্ত দুটি রুলের শুনানি শেষে হাইকোর্ট এ আদেশ দেন। মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মো. সেলিমের যৌথ বেঞ্চ 'ট্রানজিশনাল অ্যাকর্ড' নামে জোটটির কার্যক্রম আরো ছয় মাস চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন।

এই কার্যক্রমের ভবিষ্যত সম্পর্কে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক পরবর্তীকালে বলেন (দৈনিক যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর), আরসিসিকে শক্তিশালী করার জন্য এর মধ্যে সরকার ৬০ জন প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। পর্যায়ক্রম বাকি নিয়োগ সম্পন্ন করার পর সব মিলিয়ে ১৩০ জন প্রকৌশলী আরসিসিতেই স্থায়ীভাবে কাজ করবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। পুরো জনবল, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সরকারের সব ধরনের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করলে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের চেয়েও এটি (আরসিসি) ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। তবে সাময়িকভাবে হলেও অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরাম (আইএলআরএফ)। ফোরাম মনে করছিল, বাংলাদেশে পোশাকখাতে গত ৫ বছরে যেসব কাঠামোগত সংস্কার ঘটেছে সেটার সুফল ধরে রাখতে আরও খানিক সময় অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের নজরদারি প্রয়োজন। এ বিষয়ে আইএলআরএফের নির্বাহী পরিচালক জুডি গেয়ারহার্ট বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর তাদের কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের পোশাক খাতের শ্রমমান এবং কর্মপরিবেশের নিরাপত্তায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সেটির ধারাবাহিকতা থাকা দরকার।

একই প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন (১ জুন, দৈনিক বণিকবার্তা), বিশ্বের আর কোনো দেশে এই জোট দুটির কার্যক্রম নেই। শুধু বাংলাদেশে রয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। এ পাঁচ বছরের মধ্যে কোথাও কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। এর অর্থ, আমাদের কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট। আমাদের কারখানাগুলোর ইলেকট্রিক্যাল ও ফায়ার সেফটি, স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটি সব রেনোভেশন করা হয়েছে। অনেকগুলো কারখানা এরই মধ্যে গ্রিন ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কারখানাগুলোর অবস্থা ভালো।

৩

পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন এবং মজুরি বৃদ্ধি

২০১৮ সালে পুরো বছর জুড়ে পোশাক খাতের শ্রমিকরা ১৬ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বলা যায়, এ বছর শ্রমখাতের প্রধান সংবাদ ছিল এটা। এই আন্দোলনের চাপেই পোশাক তৈরি খাতের মজুরি বৃদ্ধির সুপারিশের গেজেট প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর। অথচ মজুরি বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল জানুয়ারিতে। অর্থাৎ বোর্ড গঠনের পর মজুরির সুপারিশ দিতে প্রায় এক বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত পোশাক শিল্প। এই খাতে মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ মাত্রই ইতিবাচক বড় ঘটনা। মালিক সমাজ বলেছেন, তারা 'সাধ্যের অতিরিক্ত' দিয়েছেন। তাঁদের এইরূপ মনোভাবের পরও মজুরি বোর্ডের সুপারিশে শ্রমিক সংগঠনগুলো ছিল অসন্তুষ্ট। তারা ঐ মজুরি প্রস্তাবের বিষয়ে বিপুল সংখ্যায় মজুরি বোর্ডে আপত্তিপত্র জমা দেয়।

পোশাক খাতসহ বিভিন্ন শিল্পখাতে লাখ লাখ শ্রমিকের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কাজের সফলতাও অনেকাংশে এসব খাতের মজুরি ঘোষণার ওপর নানাভাবে নির্ভর করে। সে কারণে এরূপ মজুরি ঘোষণা মাত্রই সমাজে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছিল।

মজুরি বৃদ্ধির গ্রেডভিত্তিক চিত্র

পোশাক তৈরি খাতে শ্রমিকদের সাতটি ভাগ আছে ('গ্রেড এক' থেকে– 'গ্রেড সাত')। এছাড়া আছে 'শিক্ষানবিশ' নামে আরেকটি বর্গ। যাদের মজুরি সপ্তম গ্রেডের নীচে।

নতুন মজুরি কাঠামোতে সপ্তম গ্রেডের শ্রমিকদের 'মোট মজুরি' ধরা হয়েছে ৮ হাজার টাকা; যাতে 'মূল মজুরি' হলো ৪ হাজার ১০০ টাকা। বাকিটা অন্যান্য ভাতা। ২০১৩ সালের পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোতে সপ্তম গ্রেডের শ্রমিকদের মূল মজুরি ছিল ৩ হাজার টাকা।

সরকারি মজুরি ঘোষণা মতে, মূল মজুরি প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বাড়ে। সে অনুযায়ী সপ্তম গ্রেড শ্রমিকদের ২০১৩ সালের মূল মজুরি ২০১৮ সালে হয়েছে ৩ হাজার ৮২৯ টাকা। আর সর্বশেষ নতুন মজুরি কাঠামোতে সপ্তম গ্রেডের জন্য মজুরি ঘোষিত হয় ৪ হাজার ১০০ টাকা। অর্থাৎ এই গ্রেডের মজুরি বাড়ালো কার্যত ২৭১ টাকা মাত্র। মূল্যস্ফীতির হিসাবকে বিবেচনা করলে প্রকৃত মজুরি কার্যত বেড়েছে বলা যায় না। বরং মজুরি নির্ধারণের পুরো পদ্ধতিটি নিয়ে গভীর প্রশ্ন উঠেছে।

পোশাক খাতের সর্বোচ্চ (প্রথম) গ্রেডের শ্রমিকদের ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে মূল মজুরি ছিল ৮ হাজার ৫০০ টাকা। এই গ্রেডের শ্রমিকরা ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির পর ২০১৭ শেষে মূল মজুরি পাওয়ার কথা ১০ হাজার ৩৩১ টাকা ৮০ পয়সা। পাঁচ বছর পর এখন তাদের মূল মজুরি ঘোষণা হলো ১০ হাজার ৪৩৬ টাকা। অর্থাৎ নতুন মজুরি ঘোষণায় তাদের মূল মজুরি বেড়েছে ১০৪ টাকা মাত্র।

অনেক গ্রেডেই এভাবে ১০০-২০০ টাকা করে মূল মজুরি বেড়েছে। তবে দ্বিতীয় গ্রেডের দৃশ্যপট অন্যরকম। এই গ্রেডে ২০১৩ সালে মূল মজুরি ছিল ৭ হাজার টাকা। পাঁচ বছরে পাঁচ শতাংশ হারে বেড়ে সেটা দাঁড়ায় ৮ হাজার ৯৩৪ টাকা। অর্থাৎ ঐ গ্রেডের শ্রমিকরা এখন ৮ হাজার ৯৩৪ টাকা পাচ্ছে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু ৮ অক্টোবরের গেজেটে দ্বিতীয় গ্রেড শ্রমিকদের মূল মজুরি ঘোষিত করা হয় ৮ হাজার ৫১৪ টাকা। বিস্ময়কর প্রস্তাব।

বেসিকের হিস্যা নিয়ে প্রশ্ন

শ্রমিকরা এবারের মজুরি কাঠামোতে মূল মজুরির হিস্যা কমে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যেমন, ২০১৩ সালের কাঠামোতে প্রথম গ্রেডে মোট মজুরি ছিল ১৩ হাজার টাকা আর মূল মজুরি ছিল ৮ হাজার ৫০০ টাকা। অর্থাৎ মোট বেতনে মূল মজুরির হিস্যা ছিল প্রায় ৬৫ ভাগ। এবার একই গ্রেডে মূল মজুরির হিস্যা ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ ৫ ভাগ কম।

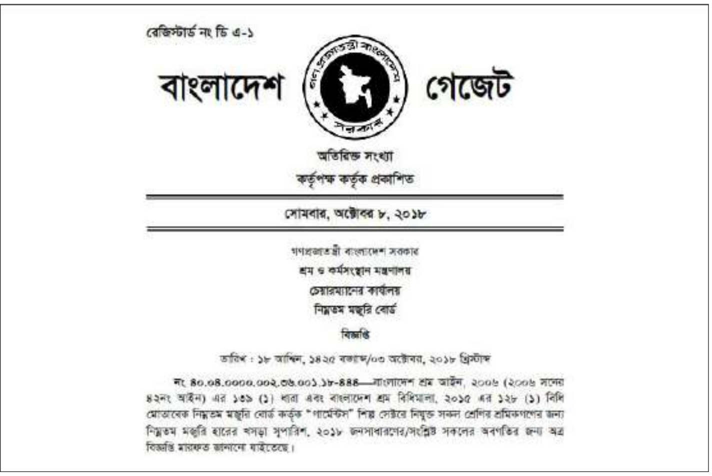

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৮ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৩ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪০.০৪.০০০০.০০২.৩৬.০০১.১৮-৪৪৪—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন) এর ১৩৯ (১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ১২৮ (১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক "গার্মেন্টস" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া সুপারিশ, ২০১৮ জনসাধারণের/সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

দ্বিতীয় গ্রেডে মূল মজুরির হিস্যা এবার প্রায় ৫৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোতে দ্বিতীয় গ্রেডে মূল মজুরির হিস্যা ছিল ৬৪ শতাংশের বেশি। এভাবে অধিকাংশ গ্রেডে বেসিকের হিস্যা কমে গেছে এবার।

সপ্তম গ্রেডে মূল মজুরির হিস্যা হয়েছে এবার মোট মজুরির ৫১ ভাগ। পূর্ববর্তী (২০১৩) মজুরি কাঠামোতে সেটা ছিল ৫৭ শতাংশ। ২০১৩ সালের পূর্বে প্রতিটি মজুরি ঘোষণায় সর্বনিম্ন মোট মজুরিতে বেসিকের হিস্যা থাকতো ৬০ থেকে ৬৭ শতাংশের মধ্যে। শ্রমিকরা এবারের নতুন প্রবণতায় হতাশা প্রকাশ করছিল।

পোশাক খাতে এ বছর যখন মজুরি নির্ধারিত হচ্ছে– সেই একই সময়ে বেকারি (১৫ জুলাই), দর্জি (১০ মার্চ), এলুমিনিয়াম (২৪ সেপ্টেম্বর) খাতের শ্রমিকদেরও মজুরি নির্ধারিত হলো। এসব খাতের মজুরি কাঠামোর সঙ্গে পোশাক খাতের মজুরি প্রস্তাবের বেসিকের তুলনা করলে শ্রমিকদের হতাশার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। বেকারিতে সর্বনিম্ন গ্রেডে মূল মজুরি মোট মজুরির ৫৬ শতাংশ, দর্জি খাতে সেটা ৬২ শতাংশ এবং এলুমিনিয়াম শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশ।

যেকোন মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণায় 'বেসিক' বা মূল মজুরি কত বাড়ছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে ভিত্তি করেই উৎসব ভাতা, ওভারটাইম ইত্যাদি হিসাব করা হয়। ওভারটাইম সচরাচর মূল বেতন হারের দ্বিগুন হয়ে থাকে। নিয়ম হলো, শ্রমিক মাস জুড়ে ঘণ্টায় (২৬ দিন/২০৮ ঘন্টা ধরে) যে পরিমাণ মূল বেতন পায়– ওভারটাইম পাবে ঘন্টায় তার দ্বিগুন। সুতরাং মূল মজুরি সামান্য বৃদ্ধি মানেই আগামীতে পোশাক খাতের শ্রমিকদের ওভারটাইমও সামান্যই বাড়বে। একইভাবে মূল মজুরি কমে গেলে তার ওভারটাইম প্রাপ্তিও কমে যাবে।

'বেসিক'-এর হিস্যা কমার পাশাপাশি ৫ বছর ব্যবধানে মজুরি বৃদ্ধির হারও কমেছে এবার। পোশাক শ্রমিকদের পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোতে সর্বনিম্ন মোট মজুরি ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এবার সেটা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৫ শতাংশ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধির বিষয়টি বাদ দিয়ে হিসাব করলে গতবারের সর্বনিম্ন মোট মজুরি থেকে এবারের সর্বনিম্ন মোট মজুরি ৫১ শতাংশ বেড়েছে বলা যায়। অথচ ২০১৩ সালের ঘোষণাকালে সর্বনিম্ন স্তরে মোট মজুরি বেড়েছিল পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোর চেয়ে ৭৭ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ এবার ২৬ ভাগ কম হারে মূল মজুরি বেড়েছে। প্রায় অনুরূপ অবস্থা অন্যান্য গ্রেডেও। যেমন প্রথম গ্রেডে ২০১০ সালে মোট বেতন ছিল ৯ হাজার ৩০০ টাকা; ২০১৩ সালে সেটা হয় ১৩ হাজার টাকা। প্রায় ৪০ ভাগ বৃদ্ধি। এবার ১৩ হাজার থেকে সেটা বেড়েছে ১৭ হাজার ৫০৪। অর্থাৎ বৃদ্ধি ৩৫ ভাগ। গত দফার চেয়ে পাঁচ ভাগ কম বৃদ্ধির প্রস্তাব।

> বাংলাদেশে পোশাক খাতেই প্রবৃদ্ধি ঘটছে বেশি এবং পোশাক খাতকে দেয়া রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাও উল্লেখ করার মতো। তবে পোশাক খাতকে দেয়া প্রণোদনার কোন হিস্যা শ্রমিকদের পকেটে আসছে কি না নতুন মজুরি কাঠামোর বিশ্লেষণে সে বিষয়ে গভীর প্রশ্ন থেকে যায়।

অন্যান্য খাতের সঙ্গে পোশাক খাতের মজুরি-তুলনা

বিগত কয়েক বছর মজুরি বোর্ড বেশ সক্রিয়তার সঙ্গে অনেকগুলো খাতের মজুরি নির্ধারণ করলো। এটা ভালো প্রবণতা। তবে সমসাময়িক অন্যান্য মজুরি ঘোষণার সঙ্গে পোশাক খাতের মজুরি কাঠামোর তুলনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই খাতের মজুরির নিম্ন হার চোখে পড়ে।

এ বছর চামড়া খাতে নতুন যে মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয় (ফেব্রুয়ারিতে) তাতে সর্বনিম্ন গ্রেডের শ্রমিকদের মোট মজুরি ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা। শিপব্রেকিং খাতে (ফেব্রুয়ারিতে) সর্বনিম্ন মজুরি হলো ১৬ হাজার টাকা। এলুমিনিয়াম ও এনামেল শ্রমিকদের (সেপ্টেম্বরে) সর্বনিম্ন মজুরি হলো ৮ হাজার ৭০০ টাকা।

২০১৮ সালে ঘোষিত কয়েকটি খাতের ন্যূনতম মোট মজুরির তুলনামূলক চিত্র			
জাহাজভাঙ্গা শিল্প	ট্যানারি শিল্প	এলুমিনিয়াম	গার্মেন্ট
১৬০০০	১৩৫০০	৮৭০০	৮০০০

সমসাময়িককালে ঘোষিত বিভিন্ন খাতের মজুরি কাঠামোতে সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন গ্রেডের যে ব্যবধান তার তুলনাতেও দেখা যায় পোশাক খাতে ঐ ব্যবধান বেশি। পোশাক খাতে প্রথম গ্রেড এবং সর্বশেষ গ্রেডের মধ্যে মোট মজুরিতে ব্যবধান দ্বিগুনের বেশি। কিন্তু ট্যানারি, জাহাজাভাঙ্গা, এলুমিনিয়াম, বেকারি ইত্যাদি প্রতি খাতে তা দ্বিগুনের অনেক কম।

উপরোক্ত খাতগুলোর মধ্যে ট্যানারি ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে 'শিক্ষানবিশ' শ্রমিকদের মজুরি যথাক্রমে ৭ হাজার ও ৮ হাজার। পোশাক শিল্পে তা ৫ হাজার ৯৭৫। অর্থাৎ প্রথমোক্ত খাতগুলোতে শিক্ষানবিশসহ সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমিকদের মজুরি পোশাক খাতের নীচের স্তরের শ্রমিকদের মজুরির চেয়ে বেশি। অথচ বাংলাদেশে পোশাক খাতেই প্রবৃদ্ধি ঘটছে বেশি এবং পোশাক খাতকে দেয়া রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাও উল্লেখ করার মতো। তবে পোশাক খাতকে দেয়া প্রণোদনার কোন হিস্যা শ্রমিকদের পকেটে আসছে কি না নতুন মজুরি কাঠামোর বিশ্লেষণে সে বিষয়ে গভীর প্রশ্ন থেকে যায়।

এদিকে অক্সফামের এক গবেষণার আলোকে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে (২২ জানুয়ারি ২০১৮) জানা যায়, বিশ্বের সাত প্রধান তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। শোভন জীবনযাপনের জন্য যে অর্থ দরকার, তার চেয়ে অনেক কম অর্থ পান বাংলাদেশের শ্রমিকেরা। 'রিওয়ার্ড ওয়ার্ক, নট ওয়েলথ' নামের এ প্রতিবেদনে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি এবং এসব সম্পদ যেসব মানুষের শ্রমে-ঘামে অর্জিত হয়, তাদের দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বিশ্বের সাতটি প্রধান পোশাক তৈরিকারক দেশে বসবাসের জন্য ন্যূনতম শোভন মজুরির চিত্র তুলে ধরা হয়। এই তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও আছে ভারত, চীন, শ্রী লঙ্কা, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকেরা সবচেয়ে কম মজুরি পান। বাংলাদেশে বসবাসের জন্য শোভন মজুরি প্রয়োজন ২৫২ মার্কিন ডলারের সমান অর্থ। এর বিপরীতে একজন শ্রমিক পাচ্ছিল অনেক কম।

৪

‘শ্রমিকের পৃথক কিছু স্বার্থ আছে, যা মালিকের স্বার্থ থেকে আলাদা’

সাক্ষাৎকার

জলি তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক,
গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

‘অনেক সংগঠন আছে। তবে তাদের আন্দোলনমুখী করা যাচ্ছে না। পুরো শ্রমিক অঙ্গনে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে। সেক্টরগুলোতে সংগ্রাম হচ্ছে। সেই তুলনায় জাতীয় পর্যায়ে হচ্ছে না। মূল কারণটা রাজনৈতিক। বামপন্থী রাজনীতির ধারা দুর্বল হয়ে গেছে; আবার বিদ্যমান নেতৃত্বের এক অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ‘মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই’–এরকম একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে।’

শ্রমিক সংগঠক হিসেবে এমুহূর্তে তরুণতম একজন আপনি। ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে এক দফা কারাভোগেরও শিকার হলেন। শুরুতে জানতে চাইছি কীভাবে এলেন শ্রমিক রাজনীতিতে? ছাত্র রাজনীতির অঙ্গন থেকেই বোধহয় এসেছিলেন? কী বিবেচনা থেকে এসেছিলেন?

বলা যায়, খুবই সাধারণ একটি আকাঙ্খা থেকে শিক্ষাঙ্গন থেকে শ্রমিক অঙ্গনে প্রবেশ আমার। শিক্ষাঙ্গনে, সমাজতান্ত্রিক ধারার ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম। যেহেতু সেই রাজনীতিতে থেকে সমাজে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতাম এবং সেই পরিবর্তনের একটা বড় শক্তি হওয়ার কথা শ্রমিক শ্রেণীর– তাই সিদ্ধান্ত ছিল শ্রমিক সংগঠক হিসেবে কাজ

করবো। বলা যায়, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নই আমাকে ২০০৫ থেকে শ্রমিক রাজনীতির অঙ্গনে টেনে এনেছে।

আপনি কী ‘সার্বক্ষণিক সংগঠক’ হিসেবে কাজ করছেন?

হ্যা, একজন সার্বক্ষণিক হিসেবেই কাজ করছি।

এই মুহূর্তে, এই ২০১৮ সালে, শ্রমিক অঙ্গনের অবস্থা কী দেখছেন?

আন্দোলন-সংগ্রামের দিক থেকে অবস্থা ভালো এটা বলা যায় না। অন্তত জাতীয় পর্যায়ে। কিছু সেক্টরে লড়াই সংগ্রাম হচ্ছে। গার্মেন্ট খাতে মজুরি আন্দোলন এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রম আইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি।

এই অবস্থা কী আপনাকে হতাশ করছে?

এরকম পরিস্থিতি অনুমান করেই সংগঠক হিসেবে কাজ করতে এসেছি। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জাতীয়

পরিমন্ডলটি এক ধরনের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের খপ্পরে পড়ে গেছে। সেটাকে আবার বিপ্লবী ধারায় আনতে হবে এটাই আমার লক্ষ্য ছিল শুরু থেকে। কাজটা অবশ্য কঠিন।

কী ধরনের সমস্যা দেখছেন?

শ্রমিক আন্দোলনের কিছু প্রথাগত ধারা আমাদের এখানে ছিল। যেমন রেজিস্ট্রার্ড সংগঠনই কেবল কথা বলতে পারবে। শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা ও ধাপ অনুসরণ করে এগোতে হবে। ইত্যাদি। কিন্তু এখন যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সংগঠনই করতে দেয়া হয় না– সেখানে কখনও কখনও আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত ধরনও দেখতে হবে। এর ফলে রেজিস্ট্রেশন নেই এমন সংগঠনও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চয়ই সেসব স্বতঃস্ফূর্ততাকে বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলনে রূপান্তর ঘটাতে হবে। তবে এসব বিষয়ে জ্যেষ্ঠ অনেক সংগঠকদের সঙ্গেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

আপনাদের সংগঠন, গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অনেকদিন রেজিস্ট্রেশন ছিল না বলেই কী আপনি এরকম বলছেন?

আমাদের রেজিস্ট্রেশন ছিল না, কিন্তু রেজিস্টেশন পাওয়ার সকল শর্তই পূরণ করেছিলাম আমরা এবং তিনবার আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হয়। ফলে আমরা মনে করছিলাম, বাংলাদেশ সংবিধান সংঘবদ্ধ হওয়ার যে অধিকার দিয়েছে, চিন্তা ও বিবেকের যে অধিকার দিয়েছে তার আলোকে হলেও আমরা কাজ করতে পারি। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবেও রেজিস্ট্রার্ড এবং আনরেজিস্ট্রার্ড উভয় ধারা থেকেই শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে।

আপনাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছিলো না কেন?

এমন কিছু সাংগঠনিক যুক্তি দেখানো হয় যেগুলোকে আমাদের কাছে অতিতুচ্ছ বিষয় মনে হয়। আমরা মনে করছি, মূলত রাজনৈতিক কারণেই আমাদের সংগঠনকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছিলো না। ২০০৬ পর্যন্ত আমরা অনেক বেসিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পেয়েছিলাম। পরে আর পাচ্ছিলাম না। ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ২০১১ থেকে মামলা শুরু। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতেও বাধা ছিল। বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছিলো। তবে রেজিস্ট্রেশন না দেয়া হলেও আমরা সক্রিয় থেকেছি। গার্মেন্ট খাতে এমন অনেক সক্রিয় সংগঠন রয়েছে যারা রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছে না। এছাড়া, আন রেজিস্ট্রার্ড অবস্থাতেই কারখানা পর্যায়ে, এমনকি জাতীয় পর্যায়ে সরকার ও মালিকদের সঙ্গে আমরা অনেক দরকষাকষিতে বসেছি। পরে অবশ্য আমরা নিবন্ধন পাই। যদিও 'গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র' বা সংক্ষেপে গার্মেন্ট টিইউসি' নামে আমরা পরিচিত–কিন্তু এখন আমাদের আইনী নাম 'বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্র'; রেজিস্ট্রেশন নং বি-২১৯৬।

> অনেক কারখানাতে ইউনিয়ন আছে। কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের কর্মকান্ড নাই। অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। কোন কারখানাতে কী নির্বাচন আছে? এমনকি, লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএতেও এখন আর নেতৃত্ব নির্বাচিত হচ্ছে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে যেন বিদায় দেয়া হচ্ছে।

এটা কি সত্য নয় যে, আপনি যে খাতে সক্রিয়, সেই পোশাক শিল্পে অনেক সংগঠন- সেই তুলনায় শ্রমিকদের সংগঠিত দেখা যায় না।

অনেক সংগঠন। ৬০-৭০টি হবে বোধহয়। কিন্তু কিছু আছে মালিক সমাজের পছন্দে গঠিত। কিছু আছে সরকারের পছন্দে গঠিত।

এটা কী সত্য যে, শ্রমিকরা সংগঠনগুলোর প্রতি কম আগ্রহ দেখাচ্ছে?

সমস্যাটা আমার কাছে ভিন্ন মনে হয়। বাস্তব অবস্থা শ্রমিকদের সাড়া দেয়ার মতো। শ্রমিকরা পরিবর্তন চাইছে। শক্ত হয়ে দাঁড়ালেই আন্দোলন হয়। কিন্তু সংগঠক কম। যারা শ্রমিকদের সংগঠনে নিয়ে আসবে তারা নেই; বা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ স্থবিরতা নেতৃত্ব পর্যায়ে। লিডারশিপই সমস্যা। শ্রমিকরা নয়। তবে, গার্মেন্টসহ প্রধান খাতগুলো ক্রমেই নারীমুখী হচ্ছে। তাদের শ্রমিক সংগঠনে আনাটা বাড়তি চ্যালেঞ্জ আকারে থাকবেই। কিন্তু তাদের কাছে গেলে তো তারা আসছে। আমরা তো কোথাও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছি না।

জাতীয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে আপনি উৎসাহ-ব্যাঞ্জক নয় বলেছিলেন। এর কারণ কী?

অনেক সংগঠন আছে। তবে তাদের আন্দোলনমুখী করা যাচ্ছে না। পুরো শ্রমিক অঙ্গনে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ

করছে। সেক্টরগুলোতে সংগ্রাম হচ্ছে। সেই তুলনায় জাতীয় পর্যায়ে হচ্ছে না। মূল কারণটা রাজনৈতিক। একদিকে বামপন্থী রাজনীতির ধারা দুর্বল হয়ে গেছে। আবার বিদ্যমান নেতৃত্বের এক অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 'মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই'–এরকম একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে। বিপরীতে এই সত্য তুলে ধরার লোক কম যে, শ্রমিকের পৃথক কিছু স্বার্থ আছে, যা মালিকের স্বার্থ থেকে আলাদা। তবে এর মাঝেও লক্ষ্য করুণ, গার্মেন্ট খাতে মজুরির আন্দোলন বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তীব্র বাস্তবতা থাকার পরও মজুরি বাড়ছে কম। যেমন চা খাত। কোথাও কোথাও দালাল সংগঠকদের খপ্পরেও পড়ছে শ্রমিকরা। ফলে তাদের মাঝে বিশ্বাসহীনতাও তৈরি হচ্ছে কখনও কখনও।

কিন্তু এও তো দেখা গেল, বিজিএমইএ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে মজুরি বাড়াতে চেয়েছিল এবার?

মালিকরা সেরকম একটা ইমপ্রেশন দিয়েছে সবাইকে। কিন্তু কার্যত পোশাক খাতে ন্যায্য মজুরির বিষয়ে বিজিএমইএ আন্তরিক নয়। সেখানে ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবি ছিল এবং আছে। মজুরিবোর্ড মজুরি কমিয়ে দিয়েছে বলে আমরা মনে করি।

২০১৮ সালে আপনারা যে কারাভোগ করলেন, সেটা কী কারণে?

সেটা আশিয়ান গার্মেন্টসের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে। প্রায় দুই বছর আগে সেখানে বেসিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলছিল। আমরা সেখানে বেসিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকল শর্ত মেনে আবেদন করার পরও দেয়া হয়নি। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনা করতে যেয়ে বিজিএমইতে একদিন সংঘাতপূর্ণ একটা অবস্থা তৈরি হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, আমাদের শ্রমিক সংগঠকরা ছিলেন। তারপরও আমাদের নামে মামলা দেয়া হয়। শ্রমিকদের মামলা নেয়া হলো না। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আগাম জামিনও নিয়েছিলাম। কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে গেলে সাত জনকে জামিন বাতিল করে আটক করা হয় এবং কারাগারে পাঠানো হয়। পরে উচ্চ আদালতে এক সুয়োমোটো মামলায় মাননীয় বিচারপতি আবার জামিন দেন।

সেখানে শ্রমিকদের আন্দোলনের অবস্থা কী দাঁড়ালো?

তিন মাস পর কারখানায় হঠাৎ রহস্যময় আগুন লাগলো। মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের আপোষরফায় বিজিএমইএ সহযোগিতা করলো না। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। মালিক কারখানা বন্ধ করে দিলেন। তবে শ্রমিকরা বন্ধজনিত প্রাপ্য অর্থ আদায়ে চুক্তি করতে পেরেছে। যদিও আইনগত পাওনার অর্ধেকও পায়নি এখনও। মুন্না, রাসেলসহ কারখানার শ্রমিক নেতারা মিথ্যা মামলা মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে।

সংগঠন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী সম্প্রতি কিছু কমেনি?

কারখানা পর্যায়ে ইউনিয়ন গড়তে গেলেই নির্যাতন নেমে আসে। শোকজ, বরখাস্ত ইত্যাদি থেকে সেটা শুরু হয়। সংগঠন গড়ে দাবি দাওয়া তুলে ধরলে কারখানা বন্ধে যেয়ে ঠেকে পরিস্থিতি। আসলে প্রকৃত স্বাধীন ইউনিয়ন যেভাবে কর্মকান্ড চালায় সেটা কোন পোশাক কারখানায় নাই।

আপনি বলতে চাইছেন পোশাক কারখানাগুলোতে ইউনিয়ন নেই?

অনেক কারখানাতে ইউনিয়ন আছে। কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের কর্মকান্ড নাই। অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। কোন কারখানাতে কী নির্বাচন আছে? এমনকি, লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএতেও এখন আর নেতৃত্ব নির্বাচিত হচ্ছে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে যেন বিদায় দেয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলতে পারি– সরকার, মালিক, বিভিন্ন সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, মাস্তান এইরূপ বহু প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দাবি-দাওয়ার কথা বলতে হয়। যা দুরূহ।

শিল্পে দাবি দাওয়ার মিমাংসার ক্ষেত্রে আসলে সরকার ও মালিকরাও দুটি পক্ষ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ত্রিপক্ষীয় দরকষাকষির পরিবেশটি গড়ে উঠতে সমস্যা কোথায়?

সরকারকে এখানে অনেক সময়ই মালিকদের পাশে দেখা যায়। কেবল ব্যাপক চাপ তৈরি হলেই সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। আর মালিকদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় সামন্ততান্ত্রিক একটা মন। তারা শিল্পপতির মনোভাব থেকে নয়–একজন জমিদারের মনোভাব লালন করেন কখনও কখনও। চিরায়ত পুঁজিতান্ত্রিক মনোভাবও এখানে অনুপস্থিত। তবে আগের চেয়ে পরিস্থিতি অন্তত এটুকু পরিবর্তন হয়েছে–শ্রমিকদের হয়তো এখন আর খালি হাতে বিদায় নিতে হয় না।

৫

'চামড়া শিল্পনগরী'তে শ্রমিকদের দুর্দশা অব্যাহত

এবার দূষিত হচ্ছে সাভারের নদী

সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের দুর্দশা দেড় বছর শেষেও অব্যাহত ছিল। ২০১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে কারখানাগুলো ঢাকার হাজারিবাগ থেকে এখানে স্থানান্তর হলেও নতুন শিল্পপল্লীতে নাগরিক সুবিধার অবকাঠামো গড়ে না ওঠায় শ্রমিকদের জীবনযাপনে হয়রানি চলছেই। অথচ এটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিমুখী শিল্পখাত।

যে যুক্তিতে চামড়া শিল্পকে ঢাকা থেকে সাভারে নেয়া হয়েছে– সেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও এখানে প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নত হয়নি। ২০১৮ সালের শেষার্ধে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার এখনও পরিপূর্ণ মাত্রায় কাজ করছে না। ফলে আগে যেখানে চামড়া কারখানার বর্জ্যে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা দূষিত হতো এখন সেখানে স্বল্পমাত্রায় হলেও সাভারে ধলেশ্বরী নদী দূষিত হচ্ছে। কঠিন বর্জ্যগুলোর (চামড়ার উচ্ছিষ্ট, ঝিল্লি, চামড়ার টুকরা, পশুর কান, শিং ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা বেশি সমস্যা রয়ে গেছে। যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে তা। স্থানীয় ড্রেনেজ ব্যবস্থাও দুর্বল। এসবের প্রতিক্রিয়ায় আশেপাশের জনপদে কৃষিখাতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন সাভারবাসী। এছাড়া গোটা শিল্পাঞ্চলের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা ছিল। শ্রমিকরা বলছেন, শিল্পনগরী স্থানান্তরের শর্ত হিসেবে মালিকরা অনেক বড় বড় প্লট পেয়েছেন, ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, প্রণোদনা পেয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য এখানে বসবাসের ন্যূনতম কোন সুবিধাই রাখা হয়নি। থাকা-খাওয়ার চরম সংকট এলাকায়। নেই স্কুল-কলেজ, মসজিদ। ফলে দূরদূরান্ত থেকে যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। ট্যানারি চালু হওয়ার পর আশপাশের গ্রামগুলোতে বাসা ভাড়াও ঢাকার হাজারীবাগ থেকে অনেক বেশি। প্রতিটি কারখানার ভেতরে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ কারখানাতেই এ ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর একটি সূত্র মতে, সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১৯৯.৪০ একর জমিতে ১৫৬ ট্যানারিকে ২০৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। এরপর ১৫২ ট্যানারির লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়।

কিন্তু শ্রমিকদের জন্য এখানে বসবাসের ন্যূনতম কোন সুবিধাই রাখা হয়নি। থাকা-খাওয়ার চরম সংকট এলাকায়। নেই স্কুল-কলেজ, মসজিদ।

এদিকে, ২০১৮-এর মে মাসের শুরুতে সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে একটি কারখানায় কেমিকেলের সাথে লবণ মেশানোর সময় বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে ২ শ্রমিক মারা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অপর এক শ্রমিককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় এই শিল্পনগরীতে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার আবশ্যকতাও ফুটে ওঠে।

৬

এখন 'মালিকদের যুগ' যাচ্ছে

সাক্ষাৎকার

ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা আবুল কালাম আজাদ

'একটা শিল্প নগরীতে শ্রমিকদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। সাভারে চামড়া স্থানান্তরের সময় মালিকরা নিজেদের ক্ষতিপূরণ, প্লট ইত্যাদি নিয়ে দরকষাকষি করলেন কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থের বিষয়গুলোতে উদাসীন থাকলেন।'

চামড়া শিল্প ঢাকা থেকে সাভার স্থানান্তরের সময় আপনারা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ২০১৮ সালে এসে– এখন কি অবস্থা সেখানে?

বহুমুখী সমস্যায় পড়েছিল তারা এবং তার সবই এই শ্রমিকদের প্রত্যেকের জীবনে এখনও অনেকটা জারি আছে। কেবল অর্থের হিসাবে প্রত্যেক শ্রমিক অন্তত তিন হাজার টাকা বাড়তি খরচের মুখে পড়েছে। যারা ঢাকা থেকে সেখানে কাজে যায় তাদের গাড়িভাড়া ও সময় লাগছে অনেক। যারা ওখানে থাকছে তারাও প্রায় অধিকাংশ নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত। স্কুল পড়ুয়া সন্তান-সন্ততি নিয়ে সেখানে থাকার সুযোগ নেই।

সরকার বা এই খাতের 'মালিক সমাজ' শিল্প স্থানান্তরকালে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো যে গুরুত্ব দিলেন না– সে বিষয়ে আপনারা শ্রমিক সংগঠন থেকে কি পদক্ষেপ নিলেন?

স্থানান্তরের কথা আসলে বহু বছর আগে থেকেই চলছিল। আমরা শুরু থেকে বলেছিলাম, যেখানেই এই চামড়া শিল্পকে নেয়া হোক– সেখানেই শ্রমিকদের আবাসন, হাসপাতাল, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনার জায়গা ইত্যাদি থাকতে হবে। শিল্প স্থানান্তর নিয়ে সরকারের সঙ্গে মালিকদের প্রাথমিক আলাপেও বিষয়গুলোর স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষরের পর দেখা গেল শ্রমিকদের আবাসন, হাসপাতাল, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনার জায়গা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা নেই। ফলে শ্রমিকরা অকূল সাগরে পড়ে গেল।

এরকম কেন হলো? আপনারা কী জানতেন না?

এই পরিস্থিতির জন্য তো সরকার ও মালিকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারের দিক থেকে দেখুন, আধুনিক একটা চামড়া শিল্প গড়ার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে– সেই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে বিসিককে। যাদের এইরূপ কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই নেই। ফলে তারা জমিতে কিছু প্লট করে তা সেই সব মালিকদের দিয়ে দিয়েছে যাদের ঢাকায় ফ্যাক্টরি ছিল। কিন্তু একটা শিল্পনগরীতে তো শ্রমিকদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। আবার মালিকরাও নিজেদের ক্ষতিপূরণ, প্লট ইত্যাদি নিয়ে দরকষাকষি করলেন কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থের বিষয়গুলোতে উদাসীন থাকলেন। আমরা তখন আন্দোলন-সংগ্রামে

নামলাম। এই এলাকার সংসদ সদস্যও আমাদের সহায়তা করলেন। তাঁর সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি দেয়া হলো। তখন এইরূপ একটা সমাধান চিন্তা বেরিয়ে এলো যে, সাভারে চামড়া শিল্পের জন্য আরও জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং সেখানে তখন শ্রমিকদের আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিও গড়া হবে।

যতদূর দেখা যাচ্ছে, শিল্প চলে গেলেও শ্রমিকরা এখনও অনেকে ঢাকার হাজারিবাগেই রয়ে গেছেন। কীভাবে তাহলে সাভারে কাজ করতে পারছেন তারা?

বলা যায়, অর্ধেক শ্রমিক সেখানে গিয়েছেন। আর অর্ধেক ঢাকা থেকে যেয়ে কাজকর্ম করছেন। উভয়েরই অনেক সমস্যা। ঢাকা থেকে যারা যাচ্ছেন তাদের প্রতিদিন অনেক ভোরে উঠে রওয়ানা দিতে হয়। অনেকে সিএনজিতে যেতেন। তাতে ১২০ টাকা যেত। এই টাকা অনেক শ্রমিকের জন্য ব্যয় করা অনেক কঠিন ব্যাপার। নিরূপায় হয়ে শ্রমিকরা দল বেঁধে ১২-১৩টি বাসের ব্যবস্থা করেছে। ভাড়া করে এগুলোতে করে তারা সকাল-বিকাল আসা যাওয়া করছে। আমরা শ্রমিকদের এই বাড়তি খরচের বিপরীতে মালিকদের কাছে একটা অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছিলাম। সেটাও পাওয়া যায়নি।

চামড়া খাতে এখন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত হবে এবং শ্রমিক সংখ্যা কত হবে?

প্রায় ২৫-৩০ হাজার শ্রমিক রয়েছে এই খাতে। প্রায় দেড় শত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে বড় হবে ৩০টির মতো, মাঝারি ৫০-৬০টি এবং বাকিগুলো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, যেখানে ১০-২০ জন করে কাজ করে।

কারখানাগুলো সবই তো বেসরকারি?

হ্যা, এই খাতে সবগুলো প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায়। যার সূত্রপাত ১৯৭৫ পরবর্তীকালের বিরাষ্ট্রীয়করণ পরিকল্পনার মাধ্যমে।

মজুরি বোর্ড চামড়া শিল্পে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। আপনারা, ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নও এই খাতের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মজুরি ও সামগ্রিক সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে সর্বশেষ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সে সম্পর্কে কিছু যদি বলেন?

আমরা গত ২২ বছর ধরে দুই বছর পরপর শ্রমিকদের দাবি দাওয়া তুলে ধরছি মালিকদের কাছে। এবারও সেরকম একটা দরকষাকষি চলছে। যার ফলে অন্তত শ্রমিক মজুরি ৩০ ভাগ বাড়বে বলে আশা করছি। ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি তো থাকছেই। তার বাস্তবায়নের দাবি রয়েছে আমাদের।

ট্যানারি খাতের শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি কাঠামো

ক্যাটাগরি	মূল বেতন	মোট বেতন
গ্রেড এক	১৪,০০০	২৫,৪০০
গ্রেড দুই	১১,৫০০	২১,১৫০
গ্রেড তিন	৯,৬০০	১৭,৯২০
গ্রেড চার	৮,৩০০	১৫,৭১০
গ্রেড পাঁচ	৭,০০০	১৩,৫০০
শিক্ষানবিশ		৭,০০০

ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন এই খাতের শ্রমিকদের প্রধান সংগঠন। দীর্ঘদিন আপনারাই চামড়া খাতের শ্রমিকদের প্রায় এককভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আপনাদের পক্ষে কি আরও সবলতার সঙ্গে শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না?

এ বিষয়ে আমার অন্তত আন্তরিকতার অভাব নেই। তবে আরও সবল আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য অনেকগুলো শর্ত আছে। প্রথমত শ্রমিকদের সাহসী ও ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতায় থাকতে হবে। তাদের সকল নেতৃবৃন্দের মাঝে এসব বিষয়ে ঐক্যমত থাকতে হবে। দেশে শ্রমিক রাজনীতির কেন্দ্রীয় পরিসরেও একটা ইতিবাচক অবস্থা থাকতে হবে। সেখানে চরম বিভক্তি ও সুবিধাবাদী প্রবণতা অনেক। জাতীয় পর্যায়ে পরিস্থিতিতে মালিকদের প্রচন্ড প্রভাব। এরকম পরিস্থিতি সামনে রেখেই আমাদের কাজ করতে হয়। আমাদের সংগঠনটি কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে না। যদিও শ্রমিকরা এবং সংগঠক-নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এ অবস্থায়, একটা সংগঠন যখন কোন একক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকে না–তখন তাকে অনেক ধরনের সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। অনেক কিছু বিবেচনায় নিতে হয়। আরেকটা বিষয় হলো খাতটিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে মালিকদের ইতিবাচক মন থাকা দরকার। সেটার ঘাটতি আছে আমাদের এখানে।

আপনি কি এটা স্বীকার করবেন যে, এই খাতে আরও সক্রিয় শ্রমিক সংগঠন থাকলে শ্রমিক অধিকার আদায়ে তা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতো? আপনাদের মাঝে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকতো?

আমি তা মনে করি না। একাধিক সক্রিয় সংগঠন থাকলে তাতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়ে এবং মালিকরা সেই সুযোগটি নিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে একক সংগঠন এবং ঐক্যবদ্ধতা থাকলে দাবি আদায়ে সুবিধা হয়।

আপনাদের শ্রমিক সংগঠন আর্থিকভাবে কিভাবে চলছে?

শ্রমিকরা আমাদের মাসে ২৮ টাকা করে দেয়। এটা তাদেরই সিদ্ধান্ত। আমরা সাভারে যে অফিস তৈরি করেছি, সেখানেও শ্রমিকদের সহায়তা ছিল।

আপনি দীর্ঘদিন চামড়া শিল্পে শ্রমিকদের মাঝে সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন। আপনারা নতুন সংগঠক তৈরি করতে কতটা সফল?

আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনের মাঝপথে শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করতে এসেছিলাম। নিজের পরিবারের দিকেও ভালোভাবে তাকাই নি। সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছি। আমারই বন্ধু ছিল শহীদ তাজুল ইসলাম। যিনি আদমজিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন, আমি হাজারিবাগ এসেছিলাম। এরকম শত শত তরুণ তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের শামিল হয়েছিল। আজকের রাজনীতি সচেতন তরুণদের মাঝে সেই মনোভাব দেখছি না। রাজনীতির সমগ্র পরিবেশটিই যেন নষ্ট হয়ে গেল।

আগামীতে শ্রমিক অধিকারের ক্ষেত্রে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে?

সংকট বাড়বে। এর ফলে এখন 'মালিকদের যুগ' যাচ্ছে। যদি আদর্শবাদী রাজনীতি আবার দাঁড়ায় তা হলে হয়তো এই অবস্থা বেশি দীর্ঘায়িত হবে না।

সিএসআর-এর অর্থ খরচ ইচ্ছামত! শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যয় কম

সিএসআর হলো ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়। এই খাতের অর্থ ব্যয়ও হচ্ছে বিভিন্নভাবে। ২০১৭-১৮ এর প্রথম ষান্মাসিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সিএসআর হিসেবে ৪১৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয় করেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। কিন্তু এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মানে না ব্যাংকগুলো। নির্দেশনা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ব্যয় করার কথা শিক্ষা খাতে। কিন্তু উল্লিখিত ছয় মাসে তা হয়নি। ব্যয়ের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতও।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ব্যাংকগুলোকে তাদের সিএসআর খাতের মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ শিক্ষা খাতে, ২০ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে এবং ১০ শতাংশ জলবায়ু ঝুঁকি বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করার কথা। অথচ দেখা গেছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতেই ব্যাংকগুলো মোট ব্যয়ের অর্ধেক ব্যয় করেছে। এতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় অনেক কমে গিয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে ২৩৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা মোট ব্যয়ের ৫৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। তফসিলী ব্যাংকসমূহের সিএসআর খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় ছিল শিক্ষা খাতে। এ খাতে ৭৬ কোটি ৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা মোট ব্যয়ের ১৮ দশমিক ২১ শতাংশ।

আলোচ্য প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে রূপালী, বাংলাদেশ কৃষি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন, বিডিবিএল, আইসিবি ইসলামী ও সীমান্ত ব্যাংক সিএসআর খাতে কোন ব্যয় করেনি। এছাড়া জনতা, বেসিক, বাংলাদেশ কমার্স, ব্যাংক আল ফালাহ, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন, হাবিব, ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং উরি ব্যাংক সিএসআর খাতে খুব সামান্য ব্যয় করেছে।

সিএসআর খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ। এ ব্যাংকের ব্যয়ের পরিমাণ ৪৬ কোটি ৬৮ টাকা।

অন্যদিকে ব্যাংক বহির্ভুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট দুই কোটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। এর মধ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৮ লাখ টাকা। যা মোট ব্যয়ের ২১ দশমিক ৮১ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। এ খাতে ৫৪ লাখ টাকা বা ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে।

(২৭ মার্চ ২০১৮-এর দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রতিবেদন থেকে উদ্বৃত)

৭

শ্রমমজুরি নিয়ে আইএলও-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদন

প্রকৃত মজুরি বাড়ছে সামান্যই

অক্সফামের এক গবেষণার আলোকে প্রথম আলোর প্রতিবেদনে (২২ জানুয়ারি ২০১৮) জানা যায়, বিশ্বের সাত প্রধান তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম

বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মজীবীদের আন্দোলন-সংগ্রামে এবং মজুরি নির্ধারণের আন্দোলনে 'প্রকৃত মজুরি'র প্রসঙ্গ কমই আলোচিত হয়। খুব সংক্ষেপে বললে, মোট মজুরি থেকে মূল্যস্ফীতি বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই প্রকৃত মজুরি। ফলে শ্রমজীবী-কর্মজীবীরা যখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলে তখন তারা আসলে প্রকৃত মজুরিকে হিসাবে নিয়ে মজুরি বাড়ানোর কথাই বলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলছে, বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার কমছে। ২০১৩ সালে দেশে প্রকৃত মজুরি বেড়েছিল ৬ শতাংশের বেশি। ২০১৭ সালে তা ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। আর সর্বশেষ গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হার দক্ষিণ এশিয়ার গড়; এমনকি ভারত, নেপাল ও শ্রী লংকার চেয়েও কম।

উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে শ্রমমজুরি নিয়ে প্রতি বছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে আইএলও। গত নভেম্বরে প্রকাশিত তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ধারাবাহিক কমে যাওয়ার পাশাপাশি লিঙ্গভিত্তিক প্রকট মজুরি অসাম্যের বিষয়টিও উঠে এসেছে।

আইএলও-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে বছরে গড়ে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ করে। বাংলাদেশে বেড়েছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ করে। বাংলাদেশে কৃষি ও উৎপাদন খাতের মতো দুটো বড় খাতে প্রকৃত মজুরি কমেছে। অথচ ২০১০-১৫ সালে গড়ে বার্ষিক মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সত্ত্বেও এসময় প্রকৃত মজুরি বাড়েনি।

কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০১৭ সময়ে প্রতিবেশী ভারতে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বার্ষিক গড়ে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। শ্রী লংকায় বেড়েছে ৪ ও নেপালে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ হারে। পাকিস্তানে বেড়েছে সবচেয়ে কম, বছরে গড়ে ১ দশমিক ৮ শতাংশ হারে।

আইএলওর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৩ সালে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৪ সালে এই হার ২ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে আসে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে প্রকৃত মজুরিতে প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ ছিল।

অন্যদিকে, একই বিষয়ে ২০১৮ সালের ৯ মে ঢাকার সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) তাদের এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, ২০১৩ সাল পরবর্তী বছরগুলোতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমছিল। ২০১৩ সালে একজন কর্মজীবী মাসে গড়ে ১৪ হাজার ১৫২ টাকা মজুরি পেত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে তা কমে ১৩ হাজার ২৫৮ টাকা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মজুরি কমার ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা বেশি খারাপ। পুরুষের গড় মজুরি ১.৯ শতাংশ কমলেও নারীদের কমেছে আড়াই শতাংশের মতো। ২০১৩ তে নারীদের গড় মজুরি ছিল ১৩ হাজার ৭১২ টাকা। চার বছর পর তা ১২ হাজার ২৫৪ টাকা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক বণিক বার্তা, ২৭ নভেম্বর ২০১৮ এবং কালের কণ্ঠ, ১০ মে ২০১৮

৮

‘বাজেট ২০১৮’ থেকে শ্রমজীবীরা কী পেল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ পেয়েছে ২২৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬৮ কোটি টাকা। বাজেটের আয়তন এবং অধিকাংশ খাতের বরাদ্দ যখন বাড়ছে তখন যে দুটি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মুখ্যত কমেছে তার একটি শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক এবং অপরটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক।

এটা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা যারা সচল রেখেছে সেই শ্রমজীবীদের বিষয় দেখাশোনা করে যে মন্ত্রণালয় তার জন্য বাজেট বরাদ্দ হলো মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ পেয়েছে ২২৭ কোটি টাকা। সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন বরাদ্দ এটা। এমনকি তা গত অর্থ বছরের বরাদ্দের চেয়েও অনেক কম। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬৮ কোটি টাকা। এটা এমনকি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরও প্রায় অর্ধেক। লক্ষ্যণীয়, বাজেটের আয়তন এবং অধিকাংশ খাতের বরাদ্দ যখন বাড়ছে তখন যে দুটি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মুখ্যত কমেছে তার একটি শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক এবং অপরটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক। শেষোক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৬৮৮ কোটি টাকা। এ বছর তারা বরাদ্দ পেয়েছে ৫৯৫ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য যে, এই দুই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমে যাওয়া মানেই হলো শ্রমজীবীদের স্বার্থকেন্দ্রীক কার্যক্রমেরও কাঠামোগত সংকোচন।

অন্যদিকে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দের বাইরে বাজেটে শ্রমিকদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হলো সে বিষয়ক অনুসন্ধান চালাতে যেয়ে সামাজিক সুরক্ষা খাত এবং আবাসন খাতকেন্দ্রীক অর্থমন্ত্রীর বাজেট বর্ক্তৃতায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানে বহু ধরনের ভাতা ও সহায়তা কর্মসূচি (মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, অসচ্ছল রোগী, বিধবা নারী প্রমুখের জন্য) থাকলেও চা শ্রমিক ব্যতীত শ্রমিকদের জন্য আর কোন সুরক্ষা কর্মসূচি রাখা হয়নি। চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ‘জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’র উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার করা হয়েছে। কিন্তু পোশাক শ্রমিকদের রেশনের মতো পুরানো দাবিগুলো এবারও মনযোগ পায়নি। একইভাবে ‘আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ন’ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা তৈরির যে জনপ্রিয় দাবি রয়েছে সে বিষয়েরও কোন উল্লেখ ছিল না। এছাড়া সার্বজনীন পেনশনের বিষয়টিও এবারের বাজেটেও সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি– যদিও তার একটি সম্ভাব্য কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ বয়স্ক মানুষই কোন ধরনের সরকারি পেনশানধর্মী সুবিধা পান না– অথচ যাদের বড় অংশই পুরো জীবন বেসরকারি খাতে শ্রম দিয়ে গেছেন। বেসরকারি চাকুরিজীবীদের পেনশন বিষয়ে বাজেটে কোন কর্মসূচি না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ থেকে ‘কন্ট্রিবিউটারি পেনশন ফান্ড’ নামে একটি ফান্ড চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মূলত বেসরকারি চাকরিজীবীরা এই ফান্ডের মাধ্যমে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসবেন। এই ফান্ডে বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীরা তাদের বেতনের একটি অংশ জমা রাখবেন। একই ফান্ডে চাকরিজীবীদের নিয়োগ কর্তৃপক্ষেরও অংশগ্রহণ থাকবে। এ জন্য গঠন করা হবে একটি সার্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ।

বিগত বছরের মতোই ২০১৮ সালেও যেটা লক্ষ্য করা

গেছে, তাহলো বাজেটে শ্রমজীবীদের বিষয়ে উদাসীনতা। সাধারণভাবে সমাজের সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সমন্বয়ে একটি দেশ। একটি দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সব শ্রেণী-পেশার মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক। প্রতি বছর রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার বাজেট পেশকালীন সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিষয় উল্লেখ করে থাকে। সর্বশেষ বছরও বাজেট পেশকালে দেশের জনমানুষের প্রত্যাশা ছিল সব শ্রেণী-পেশার মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয় উল্লেখ থাকবে তাতে। কিন্তু বাজেট পেশ-পরবর্তীকালে দেখা যায়, অর্থনীতির প্রাণশক্তিখ্যাত দেশে-বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বিষয়ে বাজেট অনেকাংশে নীরব। একটি দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তিকে এভাবে বাজেট ভাবনায় না আনা হলে এর পরিণতি ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

বাজেট ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশে শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের অনেকেই আছেন অর্ধবেকার। এছাড়া অনেকেই কাজ খুঁজছেন। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, তাঁদের সরকারের অধীনে গত দশ বছরে প্রবৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত হারে কর্মসংস্থান তৈরি করছে না। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, কর্মোপযোগী মানুষের সংখ্যা দেশে ১০ কোটি ৯১ লাখ। কর্মে নিয়োজিত আছেন ৬ কোটি ৮ লাখ। বাকি ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ কী করছেন কেউ জানে না! অর্থাৎ দেশে প্রকৃত বেকার মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৪৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। তদুপরি, যারা কর্মে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে খন্ডকালীন বেকারের সংখ্যা ১৪ লাখ ৬৫ হাজার। এরা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম কাজ করে। আবার কাজে নিয়োজিতদের প্রায় ৮৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। যেখানে না আছে ন্যায্য মজুরি, না আছে শ্রম আইনের সুরক্ষা। এইরূপ শ্রমজীবী, পূর্ণ বেকার ও ছদ্ম বেকারদের জন্য ২০১৮ সালের বাজেটে এমন কোন পরিকল্পনা দেখা যায়নি– যা তাদের জন্য আশার আলো হিসেবে কাজ করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এই পরিস্থিতির এক বিশ্লেষণ তুলে ধরে ২০১৮ সালের ১৪ জুন দৈনিক প্রথম আলোতে এক লেখায় মন্তব্য করেছেন, ‘কর্মসংস্থানের অভাবে একটা প্রজন্মকে হারাতে বসেছি আমরা।’

কর্মসংস্থাহীনতার মতোই দারিদ্র্য শ্রমজীবীদের মৌলিক এক সংকট। কিন্তু বাজেটে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমিকদের দারিদ্র্য লাঘবে সরাসরি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ছিল না।

বাজেটকালে শ্রমিকদের দাবি

বিগত বছরগুলোতে বাজেট প্রণয়নকালে বিভিন্ন সভা-মিছিল-সেমিনার থেকে শ্রমিকদের তরফ থেকে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপিত হতে দেখা যায়:

এক. **আর্থিক অসমতা দূর করা**

জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়ন বরাদ্দের কৌশলে এমন পরিবর্তন প্রয়োজন– যা শ্রমজীবীদের সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দূরত্ব কমিয়ে আনে।

দুই. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথে এক বড় বাধা। বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মসংস্থান বাড়ানো।

তিন. **মজুরি পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মজুরি কমিশনকে শক্তিশালী করা**

মজুরি পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং মজুরি বোর্ডের দক্ষতা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকৌশল হওয়া জরুরি। প্রতি বছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০-১৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধির বিধান করা সঙ্গত।

চার. **কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ**

দেশে যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়ানো প্রয়োজন।

পাঁচ. **কাজের সন্ধানে বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা**

কাজের সন্ধানে বিদেশ যাওয়া মানুষদের যাওয়ার ব্যয়ভার কমাতে ও এই প্রক্রিয়া সহজ করতে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

ছয়. **শ্রমজীবীদের যানবাহন সংকট ও আবাসন সংকট**

শ্রমজীবীরা নগরগুলোর প্রাণশক্তি। স্বল্প আয়ের শ্রমজীবীদের জন্য পরিবহন সুবিধা ও আবাসন সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

সাত. **নিরাপদ কর্মপরিবেশ**

শিল্প ও কর্ম পরিবেশ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বিশেষ মনযোগ দেয়া প্রয়োজন।

আট. **শ্রমিকদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের রেশনিং ব্যবস্থা**

শ্রমিক পরিবারগুলোর চাল-ডাল-তেলসহ জরুরি খাদ্যপণ্যসমূহের নির্দিষ্ট দামে পাওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে তাদের জন্য রেশন ব্যবস্থা এখন অপরিহার্য।

নয়. **আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিক হিস্যা এবং সামাজিক নিরাপত্তা**

খাতভিত্তিক সকল রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার উপকারভোগী যাতে শ্রমিকরাও হয় সেটার তদারকি জরুরি। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বর্তমানে যে বিপুল সরকারি বরাদ্দ যাচ্ছে তাতে শ্রমিক পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

দশ. **ভূমি সংস্কার ও অনুপস্থিতি ভূমি মালিকানার অবসান**

কৃষিই এখনও কর্মসংস্থানের বড় এক পরিসর। কৃষিখাতের উৎপাদন বাড়াতে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন।

এগার. **মাতৃত্বকালীন সুবিধার সম্প্রসারণ ও ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা**

সবার জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি সমান করা এবং কর্মজীবী নারীদের সন্তানদের জন্য ব্যাপক হারে ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি খাতে এরূপ সেন্টার গড়ার জন্য আর্থিক প্রণোদনা দেয়া প্রয়োজন।

বার. **শ্রমজীবী হাসপাতাল**

জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শ্রমজীবীদের অবদানকে বিবেচনায় নিয়ে এবং সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়নের স্বার্থে দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে এবং বিভাগীয় শহরে একাধিক সংখ্যায় আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

তের. **মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষায় কোস্ট গার্ডের দক্ষতা উন্নয়ন ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন**

মৎস্য শ্রমিকদের জলদস্যু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এদের রক্ষায় কোস্ট গার্ডের টহল কার্যক্রম আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগের কার্যক্রম বাড়ানো এবং নিম্নতম মজুরিবোর্ডকে ব্যবহার করে এসব খাতের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি প্রয়োজন।

চৌদ্দ. **সিএসআরএস কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি জাতীয় ভিত্তিক কাঠামো সৃষ্টি প্রয়োজন**

দেশের সকল সিএসআর কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধি-শ্রমিক প্রতিনিধি-সরকার প্রতিনিধি সমন্বয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৯

বাংলাদেশে বিদেশী কর্মজীবীদের উপস্থিতি বাড়ছে

২০১৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে জানানো হয়, কেবল বৈধভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আয়রোজগার করছেন অন্তত ৮৫ হাজার ৪৮৬ জন বিদেশি। তারা অন্তত ৩৩ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ১৬ ক্যাটাগরিতে কাজ করছেন।

২০১৮ জুড়েই বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রকে উদ্বৃত করে এই মর্মে বারংবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৈধ-অবৈধভাবে কর্মরত আছেন হাজার হাজার বিদেশী। ঢাকা ট্রিবিউন ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল সিপিডি'র সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, পোশাক খাতের বিভিন্ন কোম্পানিতে প্রায় ১৬ ভাগ কর্মী বিদেশী। একই প্রতিবেদন তাদের নিজস্ব সূত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পখাতে প্রায় পাঁচ লাখ বিদেশী কর্মীর উপস্থিতির কথা জানিয়েছে। যে বিদেশীরা বছরে আয় করেন প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। তবে বাংলাদেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বলেছেন, বৈধভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আয়-রোজগার করছেন অন্তত ৮৫ হাজার ৪৮৬ জন বিদেশি। তারা অন্তত ৩৩ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ১৬ ক্যাটাগরিতে কাজ করছেন। বৈধ বিদেশীদের মাঝে বিশ্বের অন্তত ৪৪টি দেশের মানুষ পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি বিদেশি কর্মী পাওয়া গেছে ভারতের। ভারতের প্রায় ৩৬ হাজার মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। ঢাকায় বেশি হলেও, বিদেশী কর্মজীবীরা আছেন চট্টগ্রামসহ ব্যবসাপ্রধান আরও অনেক জেলায়। ভারতের নাগরিকদের পরই বাংলাদেশে বেশি আছেন চীনের নাগরিক। দেশটির ১৩ হাজার ২৬৮ জন নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করছেন। এর বাইরে জাপানের আছেন ৪ হাজার ৯৩ জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ৩ হাজার ৩৯৫ জন, মালয়েশিয়ার ৩ হাজার ৮০ জন, শ্রী লংকার ৩ হাজার ৭৭ জন, থাইল্যান্ডের ২ হাজার ২৮৪ জন, যুক্তরাজ্যের ১ হাজার ৮০৪ জন, যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৪৪৮ জন, জার্মানির ১ হাজার ৪৪৭ জন, সিঙ্গাপুরের ১ হাজার ৩২০ জন, তুরস্কের ১ হাজার ১৩৪ জন বাংলাদেশে কর্মরত আছেন। এসবই বৈধভাবে যাঁরা আছেন তাদের হিসাব।

> বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদককে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-বিআইডিএস'র গবেষণা পরিচালক ড. নাজনীন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা অনেক। এ অবস্থায় বিদেশিদের ক্রমবর্ধমান হারে কাজ করতে আসা চিন্তার ব্যাপার।

বাংলা ট্রিবিউন ২০১৮ সালের ২৭ অক্টোবর তাদের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে লিখেছে, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এসবি'র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে 'বৈধভাবে' বসবাস করছেন ২ লাখ ৪৫ হাজার ৭৭৯ জন বিদেশি নাগরিক। তবে এই হিসাব পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ শত শত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে বিদেশীরা কাজ করে যাচ্ছে– যাদের সম্পর্কে এখনও পরিপূর্ণভাবে তথ্য আহরণ করা যায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা), এনজিও ব্যুরোসহ কোন সংস্থার কাছেই বিদেশিদের সম্পর্কে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। কেন, কী কাজে এসব মানুষ

বাংলাদেশে আসছে, কতদিন থাকবে সেসব বিষয়ে সমন্বিত তথ্য-উপাত্তের অভাবের কারণে এ বিষয়ে খবরা-খবর প্রকাশিত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আংশিক অনুমাননির্ভর সূত্রে। এনবিআর'র কাছে বিদেশি উদ্যোক্তা নিয়ে তথ্য থাকলেও বিদেশি কর্মীদের বিষয়ে কোনও তথ্য নেই।

বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদককে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-বিআইডিএস'র গবেষণা পরিচালক ড. নাজনীন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা অনেক। এ অবস্থায় বিদেশীদের ক্রমবর্ধমান হারে কাজ করতে আসা চিন্তার ব্যাপার। বিদেশী যারা বেতনভুক্ত কর্মী এবং যাদের বিকল্প বাংলাদেশে আছে তাদের নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে দেখা যায়, এইচআর (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট) এর একটা বড় অংশ বিদেশি। অথচ বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো যা পড়ায় তার শতকরা ৯০ ভাগই বিবিএ আর এমবিএ। টেক্সটাইল, ডাইংসহ যেগুলো আমাদের উৎপাদনের প্রধান খাত সেসব জায়গায় প্রচুর বিদেশি কাজ করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতেও প্রচুর বিদেশি কাজ করছে। আমাদের স্থানীয় চাকরির বাজারকে আশংকায় ফেলে বিদেশিরা কোথায় কাজ করে, কেন করে, কতজন করে তার ওপর গবেষণা জরুরি বলে মনে করেন ড. নাজনীন আহমেদ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো–এই তিন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশি কর্মীদের কাজ করার অনুমতি দেয়। পোশাক, বস্ত্র, চামড়াসহ বেসরকারি শিল্প খাতের জন্য বিডা, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বেপজা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় বিদেশিদের কাজ করার অনুমতি দেয় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করছে প্রায় ১৭ হাজার বিদেশি কর্মী। এনবিআর'র তথ্য অনুযায়ী, ১৫ হাজার বিদেশি নাগরিকের তথ্য থাকলেও আয়কর দেন এমন বিদেশির সংখ্যা ১৪ হাজার।

বাংলা ট্রিবিউনের একই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন অপ্রমাণিত সূত্র দাবি করছে বাংলাদেশে বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে কর্মরত আছেন প্রকৃতপক্ষে প্রায় ১০ লাখ বিদেশি। অবৈধ বিদেশি কর্মীদের বড় অংশই পর্যটক ভিসায় বাংলাদেশে এসে কাজ করছেন। নিবন্ধিত না হয়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারা। অন অ্যারাইভাল ভিসা নিয়েও এসেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশে প্রবেশের পর ঠিকানা পরিবর্তন করায় পরে খোঁজ করে আর পাওয়া যায় না তাদের। যারা পর্যটক ভিসায় এসে কাজ করেন

অবৈধ বিদেশি কর্মীদের বড় অংশই পর্যটক ভিসায় বাংলাদেশে এসে কাজ করছেন। নিবন্ধিত না হয়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারা। অন অ্যারাইভাল ভিসা নিয়েও এসেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশে প্রবেশের পর ঠিকানা পরিবর্তন করায় পরে খোঁজ করে আর পাওয়া যায় না তাদের। যারা পর্যটক ভিসায় এসে কাজ করেন তাদের বড় অংশই তিন বা ছয় মাস পর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে পুনরায় ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হন।

তাদের বড় অংশই তিন বা ছয় মাস পর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে পুনরায় ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হন। অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেশিরভাগই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রী লংকা, ভুটান ও মালদ্বীপের বাসিন্দা। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট-রামরুর পরিচালক সি আর আবরার বলেন, বিদেশি কর্মীদের অনেকের হয়তো ভিসা আছে কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট নেই। কাজেই কাজ করার অনুমতি নাই তাদের এখানে। প্রথমত এটার একটা সংখ্যা নিরুপন করা জরুরি। কোন সেক্টরে কারা, কিভাবে কাজ করছেন তা জানা দরকার।

উল্লেখ্য, বিদেশী নাগরিকদের নিয়ে ডাটাবেজ তৈরি করতে ২০১৬ সালে এনবিআর'র উদ্যোগে গঠিত হয়েছে টাস্কফোর্স। তবে টাস্কফোর্স তার নির্ধারিত কাজ এখনও পরিপূর্ণভাবে শেষ করতে পারেনি। তবে ২০১৭ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অক্টোবর ২০১৭), দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশীরা বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

১০

‘সকলের জন্য পেনশন’: প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ২০১৮ সালেও; তবে এ বছর শুরু হতে পারে

২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অংশগ্রহণমূলক সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুকরণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে

বাংলাদেশে কর্মজীবী মানুষের মাত্র ৫ শতাংশ সরকারি কর্মচারি। ফলে বিদ্যমান পেনশন ব্যবস্থার সুবিধাভোগী মাত্র ৫ শতাংশ কর্মজীবী। এর বাইরে আরও ৮ শতাংশ কর্মজীবী গ্রাচুইটি সুবিধা পান। বাকিদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষসহ বেসরকারি খাতের সকল কর্মজীবী-শ্রমজীবীর একটি প্রাণের দাবি ‘পেনশন’। বহু বছর ধরে রাজনীতিবিদ ও শাসকরা এ বিষয়ে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন বাংলাদেশে। কিন্তু কার্যত ২০১৮-১৯ এও অধরাই থাকছে তা। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, এই কর্মসূচি এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেই সরকারের।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের কর্মজীবীদেরও পেনশন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে প্রথম অর্থমন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আলোচনা উত্থাপিত হয় খোদ মাননীয় মন্ত্রীর তরফ থেকে পাঁচ বছর আগে ২০১৪ সালে। ২০১৪-১৫-এর বাজেট বক্তৃতাতেও এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল। এরপর থেকে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বার বার বলা হয়েছে, বেসরকারি কর্মজীবীদেরও পেনশন ব্যবস্থার আওতায় এনে পেনশন ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সাধিত হবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মসূচিটি চালু করা যায়নি। সর্বশেষ বাজেটেও এই বিষয়ে আলোচনা ও আকাংখা রয়েছে; এসেছে কিছু প্রস্তাবও– কিন্তু তা যতটা বাস্তব প্রস্তাব আকারে– তার চেয়ে বেশি অস্পষ্ট প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি রূপে। তাছাড়া সরকার যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সেটা কার্যত সরকারি কর্মচারিদের প্রাপ্ত পেনশনের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতির হতে পারে বলেই মনে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই বিষয়ে সর্বশেষ সরকার ভাবছে, বর্তমানে পেনশনসুবিধা বঞ্চিত প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা ‘পেনশন’ পেতে নিজেরা নিবন্ধন নেবেন এবং একটি রাষ্ট্রীয় তহবিলে নিজেরাই কিছু অর্থও রাখবেন। এই তহবিলে তাদের নিয়োগকারী

> ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মজীবীদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অংশগ্রহণমূলক সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুকরণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হবে। পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠনের সাথে সাথে বেসরকারি পর্যায়ে নিয়োজিত সকল কর্মজীবী মানুষের জন্য একটি সুগঠিত, টেকসই ও বৈষম্যহীন সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে।

বেসামরিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোও অর্থ রাখবে। সরকারও তাতে তহবিল প্রদান করবে এবং সম্মিলিত অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করা হবে। তারপর ঐ অর্থ থেকে নিবন্ধিতরা 'পেনশন' আকারে অর্থ পাবেন।

অর্থমন্ত্রণালয়ে উপরোক্ত ধারণাকে বিস্তারিত করে একটি রূপকল্প তৈরি হয়েছে। এই রূপকল্পে গণকর্মচারি আইন ও বিধি সংশোধন করা এবং বৃহৎ আয়তনে একটি পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করার ধারণা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা যায়। সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির আওতায় বেসরকারি পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে বড় বড় কর্পোরেট হাউস, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে কর্মরত চাকরিজীবীদের আনার প্রস্তাব থাকবে। পর্যায়ক্রমে অন্য খাতের প্রতিষ্ঠানকেও আনা হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া জানা গেছে, প্রস্তাবিত পেনশন স্কিমের আওতায় বেসরকারি খাতের জন্য বয়স নির্ধারিত হতে পারে ৬৫ বছর। নির্ধারিত সময়ে চাকরি শেষে অর্ধেক পেনশনের টাকা এককালীন তুলতে পারবেন। বাকি টাকা তহবিলে থাকবে। সে অর্থ পরবর্তীকালে প্রতি মাসে ধাপে ধাপে ওঠাতে পারবেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বের অনেক দেশে 'সামাজিক পেনশন' নামে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে অর্থ দেয়া হয় পূর্ববর্তী সময়ে কোন তহবিলে তাদের তরফ থেকে অর্থ জমা করার বিধান ছাড়াই। এই বিষয়ে আইএলও'র সুপারিশ (২০১২ সালের ২০২ নং) রয়েছে। যা মূলত নির্দিষ্ট বয়স শেষে সকলের জন্য আর্থিক পেনশন সহায়তার কথা বলে। আবার অনেক দেশে এমনও বিধান রয়েছে যেখানে এইরূপ সামাজিক পেনশন দেয়া হয় কর্মকালীন সময়ে তাদের জমাকৃত অর্থের সঙ্গে সরকারি অর্থায়ন এবং তার বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় সমন্বয় করে। যেমনটি বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাব করছে।

এদিকে ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মজীবীদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অংশগ্রহণমূলক সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুকরণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হবে। পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠনের সাথে সাথে বেসরকারি পর্যায়ে নিয়োজিত সকল কর্মজীবী মানুষের জন্য একটি সুগঠিত, টেকসই ও বৈষম্যহীন সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাস থেকে অনুমান করা হচ্ছে ২০১৯ সালে সর্বজনীন পেনশন বিষয়ে সরকার নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে পারে।

১১

দেশজুড়ে প্রায় ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে

গ্যাসের সংকটে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো আশানুরূপভাবে সক্রিয় নয়

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, দেশজুড়ে পরবর্তী ১৫ বছরে নতুন করে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। সেসময় ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যেয়ে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি ছিল সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং ছয়টি ছিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত।

সরকারি উদ্যোগে নির্মাণাধীন চারটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ছিল 'মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল', 'মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল', কক্সবাজারে 'সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক' এবং মৌলভীবাজারে 'শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল'। বেসরকারি উদ্যোগে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগের মধ্যে ছিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে 'আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল', গাজীপুরের 'বে অর্থনৈতিক অঞ্চল', নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাটসংলগ্ন 'মেঘনা ইকোনমিক জোন লিমিটেড অর্থনৈতিক অঞ্চল' ও 'মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিমিটেড অর্থনৈতিক অঞ্চল', নরসিংদীর পলাশে 'এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল', মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় 'আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল'।

রাষ্ট্রীয় উপরোক্ত উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় প্রায় দুই বছর পর ২০১৮-এর মে মাসের শেষ সপ্তাহে এসে লক্ষ্য করা যায় যে, দেশজুড়ে প্রায় একশতটি অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ হয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ২০১৬ সালের ঘোষণার ১০০টির অনুমোদনও পেয়ে গেছে ৭৯টি। অনুমোদন পাওয়া ৭৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ৫৬টি সরকারি এবং ২৩টি বেসরকারি।

সরকারি ও বেসরকারি এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল অধিকাংশই বিপুল পরিমাণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠছে। যেমন চাঁদপুর উত্তর মতলবে সরকারি একটি ইকোনমিক জোন হচ্ছে প্রায় চার হাজার একর জুড়ে। পাশেই হাইমচরে হচ্ছে ৪ হাজার ৭৫৫ একর জমিতে চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-২। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে অনুরূপ একটি জোন হচ্ছে ২ হাজার ৩৫৮ একর জমিতে।

> প্রচারমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ৩০ হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং ডেভেলপার ও বিনিয়োগকারীদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রণোদনাও দেয়া হচ্ছে। যার মধ্যে আছে কর অবকাশ সুবিধা, শুল্ক সুবিধায় নির্মাণ সামগ্রী ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি।

অন্যদিকে বেসরকারি ইজেডগুলোর মধ্যে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে হবে শেখ রাসেল। নরসিংদীর পলাশে ৪০ একর জমিতে হবে পলাশ ইপিজেড, সুনামগঞ্জে ১৩৮ একর জমিতে ছাতক ইপিজেড, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ৭৫ একর জমিতে হোসেন্দী ইপিজেড, ১৪০ একর জমিতে স্ট্যান্ডার্ড গ্লোবাল ইপিজেড ও আবদুল মোনেম-২ ইপিজেড হবে। চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ১৩০ একর জমিতে কাজী ফার্মস ইপিজেড এবং আনোয়ারায় ১২২ একর জমিতে সাদ মুসা ইপিজেড। ময়মনসিংহের ভালুকায় ১০০ একর জমিতে হওয়ার কথা আনন্দ এসইজেড। ভালুকায় আরও হবে ধামসুর ইপিজেড এবং ত্রিশালে ১৫৩ একর জমিতে হবে হামিদ ইপিজেড। কুমিল্লার মেঘনায় ১৫০ একর জমিতে মেঘনা রিভারফ্রন্ট ইপিজেড ও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ৫৪ একর জমিতে মেঘনা ইপিজেড-২ স্থাপন করবে মেঘনা

গ্রুপ। রূপগঞ্জে হবে সিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইপিজেড। এ ছাড়া সোনারগাঁ এলাকায় ৭৯ একর জমিতে রহিম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইপিজেড হবে। ঢাকার গুলশানের ভাটারা এলাকায় সাড়ে ৫ একর জমিতে অনন্ত আইটি পার্ক ও নরসিংদীতে ডেভোটেক টেকনোলজি পার্ক ইপিজেড স্থাপিত হবে। হবিগঞ্জে বাদশা ইপিজেড ও বাদশা ইপিজেড-২ এবং সিলেটে ফখরুল ইসলাম ইপিজেডও অনুমোদন পাচ্ছে।

২০১৮ সালের ২৮ মে বেজার গভর্নিং বডির এক সভায় ২০টি প্রস্তাবিত 'অঞ্চল' স্থাপনের বিষয় বাড়তি যাচাই বাছাইয়েরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে কমপ্লায়েন্স শিল্প স্থাপন ও মানসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ– বেজাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সব ইপিজেডে হ্রদ ও জলাধার, বর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরির নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলে গাছ রোপণ করে সবুজ বেষ্টনি তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার ইপিজডেগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবলোয় কৃত্রিম বন সৃষ্টির নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রচারমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ৩০ হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং ডেভেলপার ও বিনিয়োগকারীদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রণোদনাও দেয়া হচ্ছে। যার মধ্যে আছে কর অবকাশ সুবিধা, শুল্ক সুবিধায় নির্মাণ সামগ্রী ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি। আর উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। সরকারের সচিব পবন চৌধুরী হলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা। পবন চৌধুরী ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বেজা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জনাব পবন চৌধুরী বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বিগত বছরগুলোতে বার বার বলেছেন প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

উল্লেখ্য, বেজা হলো বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা বেপজা থেকে পৃথক একটি সংস্থা। যদিও দুটিরই কার্যক্রম প্রায় একই রকম। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে চারটি ইপিজেড বেশ ভালো চলছে। বাকিগুলোতে এখনো প্লট খালি পড়ে আছে। যেমন, কুমিল্লায় একটি ইপিজেড আছে। সেটিকে পুরোপুরি কার্যকর না হলেও পাশেই বেজা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পাচ্ছে। উপরোক্ত পটভূমিতে ২০১৮ সালে এমন উদ্যোগের কথা শোনা গেছে যে, বেজা ও বেপজাকে একীভূত করা হবে। তবে কার্যত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এর মাঝে আবার ভারত, চীন ও জাপান চাইছে তাদের দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অর্থনৈতিক জোন। সেই লক্ষ্যে ভারতের জন্য ভেড়ামারায় এবং মংলায় দুটি জোন হচ্ছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় প্রায় ৮ শত একরে শুরু হয়েছে চীনের কোম্পানিগুলোর জন্য জোন প্রতিষ্ঠার কাজ। জাপানের জন্য গাজিপুরের শ্রীপুরে ইকোনমিক জোন হচ্ছে একইভাবে। চট্টগ্রামের মিরেরসরাইয়ে ৫০০ একর জুড়ে হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিশেষ ইকোনমিক জোন। তবে বিপুল উৎপাদন ও রপ্তানি প্রত্যাশা নিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা হলেও সময়মত প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বেজার সূত্রে জানা যায়, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কতটুকু গ্যাস-বিদ্যুত প্রয়োজন হবে তা এখনো নিরূপণ করা যায়নি। চাহিদা নিরূপণে একটি মহাপরিকল্পনা করা হচ্ছে। যে অঞ্চলগুলো স্থাপন করা হচ্ছে সেগুলোকে গ্যাসের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য বর্তমানে দেশে দৈনিক গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদা রয়েছে অন্তত ৩ হাজার ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট।

১২

চা খাতে নতুন মজুরি কাঠামো এবং নতুন সিবিএ নির্বাচন হলো

২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মাঝে পাঁচ বছরে চা শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ৩৩ টাকা। এছাড়া নতুন মজুরি হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দৈনিক ১০২ টাকা মজুরি হিসেবে একজন চা শ্রমিকের মাসিক মজুরি দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬০ টাকা এবং তাও কেবল-এ ক্যাটাগরির বাগানগুলোর ক্ষেত্রেই সচরাচর প্রযোজ্য হয়

বিশ্বের মোট চা উৎপাদনের ৩ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। এর চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ই সর্বশেষ বছরও অব্যাহত ছিল–কিন্তু বাড়েনি শ্রমিকদের জীবন মান।

এ বছর চা শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ ২০১৫ সালের অক্টোবরে চা শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছিল। সেই সময় ৬৯ টাকা থেকে দৈনিক মজুরি বাড়ানো হয় ৮৫ টাকায়। এবার বেড়েছে ৮৫ টাকা থেকে ১০২ টাকা। নতুন মজুরি প্রস্তাব বিষয়ে চা বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ চা সংসদের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০১৮ সালের ২০ আগস্ট। নতুন মজুরি ঘোষণায় উৎসব ভাতার হার নির্ধারিত হয় ৪ হাজার ৫৯০ টাকা। মালিকদের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন টি এসোসিয়েশনের শ্রমিক, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিষয়ক সাব কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যরা এবং শ্রমিকদের পক্ষে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে চা খাতের সিবিএ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাখন লাল কর্মকার সভাপতি এবং রামভজন কৈরি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নতুন মজুরি চুক্তিও তাঁরাই করেছেন।

মজুরি বৃদ্ধির চিত্র

২০১৫ সালের পূর্বে চা খাতে মজুরি বাড়ে ২০১৩ সালে। তখন দৈনিক মজুরি ৫৫ থেকে ৬৯ করা হয়। অর্থাৎ ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মাঝে পাঁচ বছরে চা শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ৩৩ টাকা। এছাড়া নতুন মজুরি হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দৈনিক ১০২ টাকা মজুরি হিসেবে একজন চা শ্রমিকের মাসিক মজুরি দাঁড়ায় তিন হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বিভিন্ন শিল্প খাতে যেসব মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয় তার মধ্যে পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ছিল ৮ হাজার টাকা, ট্যানারি খাতে ছিল ১৩ হাজার ৫০০ টাকা, বেকারি শিল্পে ছিল ৬ হাজার ৫০০ টাকা, জাহাজভাঙ্গা শিল্পে ছিল ১৬ হাজার টাকা। এমনকি ২০১৭ সালে চা প্যাকেজিং খাতের শ্রমিকদের জন্য যে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয় তাতেও ন্যূনতম মজুরি ধরা হয় ৭ হাজার ৮০ টাকা।

তবে চা বাগান মালিকরা চা শ্রমিকদের নগদ অর্থে কম মজুরি দেয়ার পক্ষে এই বলে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, এই খাতে শ্রমিকদের বাগানে থাকতে দেয়া হয় এবং কিছু রেশনও দেয়া হয়। এইরূপ রেশন অবশ্য কেবল স্থায়ী শ্রমিকদেরই দেয়া হয়– যাদের সংখ্যা পুরো শ্রমিক জনগোষ্ঠীর এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে শ্রমিকদের তরফ থেকে ২০০ টাকা দৈনিক মজুরি দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু মালিকদের তরফ থেকে ৮৫ টাকার বেশি দেয়া হয়নি। এই মজুরিও কেবল এ ক্যাটাগরির বাগানগুলোর ক্ষেত্রেই দেয়া হয়। বি ও সি ক্যাটাগরির বাগানে মজুরি আরও কম এবং সকল বাগানেই অস্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও মজুরি ছিল ৬০ টাকার মতো। উপরন্তু আলোচ্য মজুরি থেকে শ্রমিক ইউনিয়নের চাঁদা, (মাসে ১৫ টাকা) পূজার খরচ, বিদ্যুত বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে রাখা হয়। নির্ধারিত দৈনিক মজুরি পেতে একজন পাতা তোলা শ্রমিককে ২০ থেকে ২৩ কেজি পাতা তুলতে হয়।

২০১৮ সালে শ্রমিক প্রতিনিধিরা এই খাতে ২৩০ টাকা দৈনিক মজুরি দাবি করেছিলেন। কিন্তু পেলেন অর্ধেকেরও কম। এর বাইরে তাদের সপ্তাহে তিন কেজি ২৭০ গ্রাম পরিমাণের যে রেশন দেয়া হয় তারও বৃদ্ধি দাবি করছিলেন তারা। এই দুই দাবিসহ আরও কয়েকটি দাবিতে ২০১৮ জুড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাগানে শ্রমিকরা কর্মবিরতিও পালন করেছে।

চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির চিত্র (টাকায়)		
২০১৩	২০১৫	২০১৮
৬৯	৮৫	১০২

উল্লেখ্য, নগদ অর্থের বাইরে বাগানগুলোতে শ্রমিকদের যে রেশন দেয়া হয় সেটাও মালিক-শ্রমিক দরকষাকষিকালে মজুরি হিসেবেই গণ্য করা হয়। ২০১৮ এর নতুন মজুরি ঘোষণার পর দেখা যায় অস্থায়ী শ্রমিকদের নতুন হারে মজুরি দিতে অনেক বাগানকর্তৃপক্ষ অস্বীকার করছিল।

চা বাগানগুলোর শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বরাবরই তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের আরও হস্তক্ষেপ দাবি করছে। ২০১৭ সালের ১৩ জানুয়ারি দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে অতিথির ভাষণে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছিলেন, 'চা-শিল্পে কর্মরত পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিকের মজুরি মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়।' একই অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে দেশে বার্ষিক চায়ের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫৭ লাখ কেজি। আর ১৯৮০ সালে চা উৎপাদিত হয়েছিল ৪ কোটি কেজি। ২০১৬ সালে উৎপাদিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি কেজি। ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে ১৩ কোটি কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ হিসাব থেকেই দেখা যায়, চায়ের উৎপাদন ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

কিন্তু চায়ের চাহিদা ও উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পেলেও এবং বাগান মালিকদের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি উত্তোরত্তর বাড়লেও কার্যত শ্রমিকদের মজুরির বৃদ্ধি সেই তুলনায় অতি ক্ষীণ। সাধারণত চা খাতে প্রতি দুই বছর পরপর মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। তবে প্রতিবারই সেটা নির্ধারণ হতে হতে ২৪ মাসের বেশি সময় পার করে দেয়া হয়। এর ফলে মূল্যস্ফীতির হিসাবে প্রকৃত মজুরি কমে যায়।

এবার নতুন চুক্তির ফলে মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর দেখানো হয়েছে ২০১৭-এর জানুয়ারি থেকে। কিন্তু বৃদ্ধিজনিত বকেয়া দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে তিন কিস্তিতে। ৭৫ ভাগ দেয়া হবে ২০১৮ সালে এবং বাকি ২৫ ভাগ দেয়া হবে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ২০১৭ সালের মজুরির একাংশ শ্রমিকরা পাবে ২০১৯ সালে। এতে স্পষ্টতই তাদের প্রকৃত মজুরি কমে যাবে। উপরন্তু বিভিন্ন বাগান থেকে শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন যে, বকেয়া পাওয়ার সময় তারা হিসাবের মারপ্যাচে পুরোটা পাননি। উৎসব ভাতার ক্ষেত্রেও সকল শ্রমিক সমানভাবে উৎসব ভাতা পায়নি।

একটি বাগানের চিত্র- 'পানি ও টয়লেট সুবিধার তীব্র অভাব'

- সুনীল কুমার মৃধা

চা শিল্প মানেই অনেকগুলো বাগানের সমাহার। একটি বাগানের চিত্র থেকেও অন্য সকল বাগানের অবস্থা খানিকটা আঁচ করা যায়। এই বিবেচনা থেকেই এখানে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আলীনগর বাগানের একজন শ্রমিক সর্দারের সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হলো। যাতে বাগানগুলোর সর্বশেষ সরেজমিন চিত্র উঠে আসে।

আপনি আলীনগর বাগানে কী দায়িত্ব পালন করেন?

আমি সেখানে শ্রমিক সর্দার (কারখানা)।

এটা তো ডানকানের একটা এ ক্যাটাগরীর বাগান। এখানে শ্রমিক ও জনসংখ্যার চিত্রটা একটু বলুন–

এখানে মূলবাগানে প্রায় পাঁচ হাজার জনসংখ্যা। তার মধ্যে স্থায়ী শ্রমিক হলেন ১ হাজার ১১২ জন। অর্থাৎ বলতে পারেন জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হলেন শ্রমিক। বিভিন্ন মওসুমে কেউ কেউ অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ পান।

এমন কি রয়েছে যে, কোন পরিবারে একাধিক শ্রমিক আছে এবং কোন পরিবারে শ্রমিক নেই?

একাধিক জন শ্রমিক আছে এমন পরিবার সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ২ ভাগ হবে এবং কোন শ্রমিক নেই এমন পরিবার হয়তো সব মিলে ৫০টা হতে পারে।

আমরা দৈনিক মজুরির কথা জানি, এখন ১০২ টাকা। এর বাইরে শ্রমিকরা আর কি কি সুবিধা পান?

শ্রমিক পরিবারগুলো রেশন পায়। সেটার হার হলো যিনি শ্রমিক তিনি পাবেন সপ্তাহে তিন কেজি দুই শত গ্রাম আটা বা চাল। আর তার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামী পাবেন দুই কেজি পাঁচ শত গ্রাম আটা বা চাল। দু'জন সন্তান পাবেন দেড় কেজি করে। তবে ১২ বছর পর সন্তানরা আর পাবে না। কোন শ্রমিক স্বাভাবিকভাবে অবসরে গেলেও তাকে রেশন দেয়া হয়। তবে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলে দেয়া হয় না। এই রেশন দেয়া হয় এখন দুই টাকা কেজি ধরে।

রেশনের কোয়ালিটি কেমন?

চাল দেয়া হলে সেটা খাওয়া কঠিন। আটা দেয়া হলে তবু খাওয়া যায়।

অনেকে তো বাগানের জমিতে চাষাবাদও করেন?

জমিতে চাষ করার মতো পরিবার আছে ৪০ শতাংশের মতো। তাদের আবার প্রতি ৩০ শতাংশ জমির জন্য বছরে এক শত কেজি রেশন ছেড়ে দিতে হয়।

এই বাগানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি?

একটা ডিসপেনসারি আছে। সেখানে সপ্তাহে তিন দিন দু'ঘন্টার জন্য একজন ডাক্তার আসেন। কিছু সামান্য ওষুধও আছে। তবে পরীক্ষার কোন সুযোগ নেই। জটিল রোগ হলে অন্যত্র পাঠানো হয়।

এই বাগানে কি স্কুল আছে?

সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর বাইরে ব্রাকের স্কুল আছে। আমরাও প্রি-প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করি। বাগানে কোন উচ্চবিদ্যালয় নেই। ছেলে মেয়েরা তখন বাইরে পড়তে যায়।

শ্রমিকদের বাড়িঘর তো বাগান কর্তৃপক্ষই ঠিক করে দেয়?

দেয়ার নিয়ম। তবে সেটা প্রত্যাশামত ঘটে না। বছরে একবার হয়তো কিছু ঘর ঠিক করে দেয়া হয়।

পানি ও টয়লেট সুবিধার কী ব্যবস্থা?

পানি ও টয়লেট সুবিধার তীব্র অভাব। অনেক পরিবারের টিওবয়েল নাই। টয়লেটও নাই। বছরে ২-৩টা করে টিওবয়েল বসানো হয়, ৫-৭টা টয়লেট বানিয়ে দেয়া হয়।

শ্রমিকদের বিষয়গুলো কে দেখা শোনা করে?

বাগানে ১১ সদস্যের নির্বাচিত পঞ্চায়েত রয়েছে। তবে তাতে দলাদলিও রয়েছে। পঞ্চায়েতের উপরে রয়েছে ভ্যালি কমিটি। তারপর রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। তারা শ্রমিকদের বিষয় বাগান কর্তৃপক্ষের নজরে আনে।

বাগানগুলোতে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাগুলো কি দেয়া হয়?

দেয়া হয়, তবে সেটার দায়িত্বে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ। (চেয়ারম্যান, মেম্বাররা)

চা বাগানে বেকারত্বের কথা শোনা যায়..?

বেকারত্ব অনেক। সাত লাখের উপর মানুষ এই খাতে। স্থায়ী শ্রমিক আছে মাত্র এক লাখের মতো। আমাদের বাগানে পরিস্থিতি একটু ভালো। কারণ অনেক ছেলে লেখাপড়া শিখে কাজ করতে বাইরে গেছে। এই বাগানের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো। কিন্তু অনেক বাগানেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মেয়েরা কর্মসংস্থানের জন্য দূরে যায় না বা যেতে দেয়া হয় না। ফলে তাদের সমস্যা বেশি।

চা বাগানের নারী শ্রমিকরা কী মাতৃত্বকালীন সুবিধা পায়?

এটা কেবল স্থায়ী নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সেটাও অনেক শর্তাধীন। কিছু কিছু নারী শ্রমিক এখনও এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১৩

মন্ত্রিসভায় শ্রম আইনের সংশোধন অনুমোদন; শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ

কোনও কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সম্মতিতে এখন ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। আগে, এক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগতো। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলছেন, আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী শ্রমিকের স্বাধীনভাবে সংগঠন ও নেতা নির্বাচন করার অধিকার আছে

২০১৮ সালে শ্রম খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বর্তমান শ্রম আইনের কিছু সংশোধন প্রস্তাবে সরকারি অনুমোদন। ৮ অক্টোবর মন্ত্রিসভা এই নীতিগত অনুমোদন দেয়। প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহে আইনের ৪১টি ধারায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

৮ অক্টোবর এই বিষয়ক এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। তখন এই আইনের ৯০টি ধারা সংশোধন করা হয়। ২০১৮ সালে নতুন সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে আরও যুগোপযোগী এবং শ্রমবান্ধব করা হয়েছে। এই আইনে ৩৫৪টি ধারা রয়েছে। সর্বশেষ সংশোধন প্রস্তাবে দুটি ধারা, চারটি উপধারা, আটটি দফা সংযোজন করা হয়েছে। ৬টি উপধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং ৪১টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদে সংশোধিত এই আইন অনুমোদিতও হয়ে গেছে।

এই আইন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কোনও শ্রমিক মারা গেলে দুই লাখ টাকা এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে পঙ্গু হলে আড়াই লাখ টাকা দিতে হবে। যা আগের চেয়ে বাড়তি। এছাড়া কোনও শ্রমিক সংগঠন বিদেশ থেকে চাঁদা আনলে তা সরকারকে অবহিত করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন ৬০ দিনের পরিবর্তে ৫৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। শ্রমিকদের কল্যাণে যেকোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় পরিষদ করার বিধান রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে সংশোধনীতে।

এছাড়া শ্রম আইনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংশোধনের প্রস্তাবগুলো হলো, নারী শ্রমিদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১৬ সপ্তাহ হবে। সন্তান প্রসবের আট সপ্তাহ আগে এবং আট সপ্তাহ পরের সময় ছুটি দিতে হবে। নিয়মিত ছুটির বাইরে এই ছুটি হবে। কোনও কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এর আগে এক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগতো। সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনও শিশুকে কোনও কারখানায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না। ১৪ বছরের নিচে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হলে মালিকের ৫

বিবৃতিতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান বা কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না একথা সংবিধানে ও আইনে থাকলেও দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষা করে মাতৃত্বকালীন ছুটি সরকারি শ্রমিক-কর্মচারী ৬ মাস ভোগ করলেও বেসরকারি ক্ষেত্রে ৪ মাস এর বিধান সর্বশেষ সংশোধনীর পরও চালু থাকলো। এর মাধ্যমে একদেশে দুই বিধান ও অধিকারের বৈষম্য চালু

হাজার টাকা জরিমানা হবে। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে। কোনও নারী শ্রমিক সন্তানসম্ভবা হলে তার প্রমাণ পেশ করার ৩ দিনের মধ্যে ছুটি দিতে হবে। ৫১ শতাংশ শ্রমিকের অনুমতি সাপেক্ষে ধর্মঘট করা যাবে। ধর্মঘট করতে আগে দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের সমর্থনের প্রয়োজন থাকলেও সংশোধিত আইনে ৫১ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন থাকার কথা বলা হলো।

যেকোনও শ্রম আদালতে ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। না হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। এই ১৮০ দিনের মধ্যেও যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে বাকি পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে।

সংশোধিত আইন অনুযায়ী কোন কারখানায় ২৫ জনের বেশি শ্রমিক থাকলে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থাসহ খাবার কক্ষ রাখতে হবে। সেখানে বিশ্রামেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করে পরে তা উৎসব ছুটির সঙ্গে ভোগ করতে পারবেন। উৎসবের ছুটিতে কাজ করালে একদিনের বিকল্প ছুটিসহ দুই দিনের ক্ষতিপূরণ মজুরি দিতে হবে।

'অপ্রাপ্ত বয়স্ক' শব্দটি শ্রম আইন থেকে বাদ দিয়ে সেখানে 'কিশোর' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। আগে ১২ বছর বয়সী শিশুরা কারখানায় হালকা কাজের সুযোগ পেত।

সংশোধিত শ্রম আইনে খাবার ও বিশ্রামের সময় বাদে টানা ১০ ঘণ্টার বেশি কোনো শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। কারখানা ও শিল্প শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা দেড় দিন ছুটি পাবেন।

এছাড়া বলপ্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোনো স্থানে আটক রাখা, শারীরিক আঘাত এবং পানি, বিদ্যুৎ বা গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বা অন্য কোনো পন্থায় মালিককে কোনো কিছু মেনে নিতে বাধ্য করলে তা অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। শ্রমিকরা বেআইনি ধর্মঘটে গেলেও অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে তা।

কোনো মালিক বা শ্রমিক অসৎ শ্রম আচরণ করলে এক বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। আগে দুই বছর সাজার সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান ছিল। কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলে এক মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। আগে এই অপরাধে ছয় মাস কারাদন্ড দেয়া হতো। সংশোধিত আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি কোনো শিশু বা কিশোরকে চাকরিতে নিযুক্ত করলে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

এদিকে এই সংশোধন সম্পর্কে অনেক শ্রমিক সংগঠন তাদের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে, শ্রম আইন ২০০৬ প্রবর্তনের পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে এর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল করার দাবি জানানো হলেও সরকার ২০১৩-এর ন্যায় ২০১৮ সালেও যে সংশোধনী অনুমোদন করেছে তাতে পুরনো ধারার সাথে নতুন করে আরো অগণতান্ত্রিক ধারা বা আইন যুক্ত হয়েছে।

মালিকের অবহেলাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যুতে বাড়তি শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ দিন শ্রমিকরা সোচ্চার। কিন্তু সরকার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ফ্যাটাল অ্যাকসিডেন্ট এ্যাক্ট, আইএলও কনভেনশন, সোহরাওয়ার্দী কমিশনের সুপারিশ ও দেশে বিভিন্ন ঘটনায় (রানা প্লাজা, সড়ক দুর্ঘটনা, নির্মাণ খাতের দুর্ঘটনা) প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (১০ লাখ থেকে ৬৭ লাখ) প্রদানের বিষয়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে ২০০৬ সালের আইনে প্রদেয় ১ লাখ টাকার পরিবর্তে সেটাই দ্বিগুণ করে ২ লাখ টাকা দেওয়া ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিবেচনা বাদ দিয়ে একজন শ্রমিকের জীবনের দাম ২ লাখ টাকা নির্ধারণ তার পরিবারের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিবৃতিতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান বা কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না একথা সংবিধানে ও আইনে থাকলেও দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষা করে মাতৃত্বকালীন ছুটি সরকারি শ্রমিক-কর্মচারী ৬ মাস ভোগ করলেও বেসরকারি ক্ষেত্রে ৪ মাস এর বিধান সর্বশেষ সংশোধনীর পরও চালু থাকলো। এর মাধ্যমে একদেশে দুই বিধান ও অধিকারে বৈষম্য চালু থাকছে। উল্টো এতদিন ধরে চলে আসা অর্জিত অধিকার মাতৃত্বকালীন ছুটিকে মাতৃত্বকালীন অনুপস্থিতি হিসেবে উল্লেখ করাসহ বিষয়টিকে আরো জটিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে একজন নারী শ্রমিকের চাকুরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়া নতুন সংশোধনী এনে অতিরিক্ত ২ ঘন্টা

কাজ করার অনুমতি দিয়ে মালিকপক্ষকে বাস্তবে (খাবার বিরতিসহ) ১১ ঘন্টা কর্মদিবস চালুর সুযোগ করে দেয়া হলো।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী কোন শ্রমিকের স্বাধীনভাবে সংগঠন ও নেতা নির্বাচন করার অধিকার থাকার কথা। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে আইএলও কনভেনশনে স্বাক্ষর করলেও শ্রম আইনে ৩০ শতাংশ সমর্থন ছাড়া শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার বিধান এতদিন চালু ছিল। এখন তা সংশোধন করে ২০ শতাংশ করার কথা বলা হচ্ছে যা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর শ্রম আইনের ২৩ ধারা অসদাচরণ ও দন্ডপ্রাপ্তির শাস্তি, ২৬ ধারা মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকুরির অবসান, ২৭ ধারা শ্রমিক কর্তৃক চাকুরির অবসান ও ১৮০ ধারা ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা– এই ধারাসমূহ বহাল থাকলে শতাংশের হিসাবে নয়, শ্রমিকের ইউনিয়ন করা না করা মালিকদের ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। শতাংশ দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্তারোপ নয়– শ্রমিকরা চায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। আর ‘যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না সেখানে অংশগ্রহণকারী কমিটি (PC) ট্রেড ইউনিয়নের মত কাজ করতে পারবে’ শ্রম আইন সংশোধন করে এই বাক্য সংযোজন করার

ফলে মালিকরা অংশগ্রহণকারী কমিটি করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হবে। পিসি কমিটি সচরাচর মালিকের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। এর দ্বারা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতে এসব সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার আইএলও'র কাছে মুখ রক্ষা করতে পারলেও তাতে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সামান্যই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৬-১৭)’ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের কর্মসংস্থানের বড় অংশই হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। মোট শ্রমশক্তির ৮৫ দশমিক ১ শতাংশই এ খাতে নিয়োজিত। মাত্র ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ শ্রমিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৯৫ দশমিক ৪ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৮৯ দশমিক ৯ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক আর সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন ৫ কোটি ১৭ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ। এর মধ্যে নারী শ্রমিক রয়েছেন ১ কোটি ৭১ লাখ ২১ হাজার আর পুরুষ রয়েছেন ৩ কোটি ৪৬ লাখ ১৩ হাজার।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ বেশি কাজ করছে। এ সংখ্যা হচ্ছে গ্রামে ৩ কোটি ৮৬ লাখ ৪১ হাজার; আর শহরে কাজ করে ১ কোটি ৩০ লাখ ৯৩ হাজার মানুষ।

[তথ্যসূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০১৮]

১৪

‘গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নীতিমালা’ বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি; নির্যাতন কমছে না

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থা তাদের এক হিসাবে জানিয়েছে ২০১৭ সালে তারা গৃহকর্মী নির্যাতনের ৬৮টি ঘটনা জেনেছে। যার মধ্যে ১২ ক্ষেত্রে গৃহকর্মী মারা গেছে।

বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় সরকার নীতিমালা করেছে প্রায় তিন বছর হলো। পাশাপাশি এখন প্রতিবছর ১৬ জুন দিনটি আন্তর্জাতিক ‘গৃহশ্রমিক দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু কার্যত গৃহকর্মীদের জীবনে এই নীতিমালা বা দিবসের কোন বাস্তব সুফল পৌঁছেনি। ২০১৮ সালেও গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালার বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি কার্যকর উদ্যোগ দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং এ বছরও গৃহকর্মীদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি প্রচার মাধ্যমে আসছিল অবিরাম। তবে এ বছর কয়েকটি সামাজিক সংগঠন গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালাকে আইনে পরিণত করার দাবি তুলেছিল।

বছরওয়ারি হিসাবে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে ৬৪ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয় এবং এর মধ্যে ৪৩ জন মারা গেছে। ২০১৫ সালে দেশে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭৮ জন গৃহকর্মী। তাদের মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৯ জন। ২০১৪ সালে নির্যাতনের শিকার হন ৫৫ জন। তাদের মধ্যে মারা যান ২৭ জন ও আহত হয় ২৮ জন। ২০১৩ সালে নির্যাতনের শিকার ৫৬ জন গৃহকর্মীর মধ্যে মারা যান ৩২ জন ও আহত হন ২৪ জন। ২০১২ সালে নির্যাতিত ৭৮ গৃহকর্মীর মধ্যে ৪৬ জন নিহত ও ৩২ জন আহত হয়। ২০১১ সালে নির্যাতনের শিকার হন ৫৮ জন। তাদের মধ্যে মারা যায় ৩৮ জন ও আহত হন ২০ জন।

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থা তাদের এক হিসাবে জানিয়েছে ২০১৭ সালে তারা গৃহকর্মী নির্যাতনের ৬৮টি ঘটনা জেনেছে। যার মধ্যে ১২ ক্ষেত্রে গৃহকর্মী মারা গেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলা হয় না। কারণ দরিদ্র পরিবার মামলা করলেও চালাতে পারে না। এ ছাড়া নির্যাতনকারী পরিবারের ভয়ভীতি তো আছেই।

অন্যদিকে কোন ভাবে নির্যাতনের মামলা হলেও পরে ‘মীমাংসা’ হয়ে যায়। এই মীমাংসার নেপথ্যে থাকে সামান্য কিছু নগদ অর্থ।

বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের নিয়ে নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যানও নেই। তবে বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের দাবি, এই সংখ্যা ন্যূনতম পাঁচ লাখ এবং সর্বোচ্চ ২০ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। গৃহকর্মীদের মধ্যে নারী ও কন্যাশিশু বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক আছে প্রায় ৩২ লাখ। তার মধ্যে শিশু গৃহকর্মীর সংখ্যা চার লাখ ২০ হাজার এবং এর ৭৫ ভাগই কন্যাশিশু।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণে নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়সীদের গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং পূর্ণকালীন একজন গৃহকর্মীর মজুরির অংক এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে সে তার পরিবারসহ সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। তবে কেউ যদি ১২ বছর বয়সের গৃহকর্মী রাখতে চান, সেক্ষেত্রে আইনানুগ অভিভাবকের সঙ্গে তৃতীয় কোনো

প্রাণভয়ে গৃহকর্মী যখন ১১ তলার পাইপ বেয়ে নেমে এলো!

২০১৮ সালে গৃহকর্মী নির্যাতনের যেসব সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় তার মধ্যে জাহিদুল ইসলাম শাওনের ঘটনাটি সবচেয়ে ভীতিকর। ২১ জুন তার ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, গৃহকর্তাদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে শাওন ১১ তলা বাড়ির পাইপ বেয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। বাড়ির মূল ফটকে দারোয়ান থাকায় তাকে নিজের জীবন বাঁচাতে এরূপ ভয়াবহ ঝুঁকি নিতে হয়। এমনকি ১১ তলা থেকে নামার পর মানুষের হৈ হট্টগোল শুনে গৃহকর্তা তাকে আবার আটক করে নিয়ে যান এবং মারধর করেন। বিষয়টি পরে জনৈক ব্যক্তি ৯৯৯ জরুরি ফোন নম্বরে জানালে পুলিশ এসে শাওনকে উদ্ধার করে।

এসময় জানা যায় যে, শাওনকে একাধিক ব্যক্তি নির্যাতন করতেন। কখনও রড দিয়ে, কখনও বৈদ্যুতিক ক্যাবল দিয়ে তাকে পেটানো হতো। শাওনের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে। তার পিতার নাম জাহাঙ্গীর হোসেন কালু। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে সে ইস্কাটন গার্ডেনের ১২/এ নম্বর বাড়ির ১১ তলায় ব্যবসায়ী মোজাফফর হোসেনের ১১০২ নং ফ্ল্যাটে নিযুক্ত হয়েছিল। শাওন এও জানায় যে, তাকে কাজের বিনিময়ে কোন মজুরিও দেয়া হতো না। 'এছাড়া ফোনে যাতে আমি বাড়িতে কাউকে মারধরের কথা বলতে না পারি সেজন্য বাড়ির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় আমার সামনে গৃহকর্তারা বসে থাকতো। একদিন আমার বিরুদ্ধে অনেক টাকা চুরির কথা বলে। এও শোনায় যে, আমাকে মারা হবে। তখনি আমি ভয়ে পালানোর চেষ্টা করি।' এই ঘটনায় রমনা থানায় মামলা হয়েছিল (নং ৫৩; ২১-৬-২০১৮)

পক্ষের উপস্থিতিতে নিয়োগকারীকে আলোচনা করতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। অসুস্থ অবস্থায় কোনো গৃহকর্মীকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। এছাড়া নিয়োগকারীকেই নিজের অর্থে গৃহকর্মীর চিকিৎসা করাতে হবে। সর্বোপরি গৃহকর্মীকে তার নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ দিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় কোনো গৃহকর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে চিকিৎসাসহ দুর্ঘটনা ও ক্ষতির ধরন অনুযায়ী নিয়োগকারীকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পাশাপাশি গৃহকর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে নীতিমালায়। বিবেচনায় আনা হয়েছে গৃহকর্মীদের ইচ্ছামতো চাকরিচ্যুত করার বিষয়গুলোও। সেখানে বলা আছে, গৃহকর্মীকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হলে এক মাস আগে জানাতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে গৃহকর্মীকে চাকরি থেকে বাদ দিলে এক মাসের মজুরি দিতে হবে। কিন্তু কার্যত এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আলোচ্য নীতিমালায় বলা হয়েছিল, এর বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয় করবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গৃহকর্মীদের সহায়তার জন্য 'হেল্প লাইন' প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু নীতিমালার এসব অঙ্গীকার এখনও যে কার্যকর হয়নি প্রত্যাশিত মাত্রায়– তা প্রচারমাধ্যমে ভয়ংকর ধাঁচের নির্যাতনের খবরই প্রমাণ করে দিচ্ছে।

এদিকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল সরকারকে। সেই আলোকে সরকারি একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল কাজ করছে এই বিষয়ে। ২২ সদস্য বিশিষ্ট এই মনিটরিং সেলের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী। ২২ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে গৃহকর্মীদের অধিকার বিষয়ে কাজ করছে এমন অনেক বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিও রয়েছে।

এই খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নীতিমালায় বাসাবাড়িতে স্থায়ীভাবে কাজ করা গৃহকর্মীদের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য রক্ষাকবচ থাকলেও যেসব গৃহকর্মী সাময়িক সময়ের জন্য কাজ করে তাদের সমস্যাগুলো মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এই নীতিমালা। এছাড়া গৃহকর্মীদের আয়রোজগার বাড়াতে এবং তাদের কাজের শর্ত ইতিবাচক করতে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ একটা বাস্তব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এখনও ব্যাপকভিত্তিক কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

১৫

সৌদি আরব থেকে নারী শ্রমিকদের ফেরত আসা বেড়েছে

বিদেশের মাটিতে সাড়ে ৬ লক্ষাধিকের বেশি বাংলাদেশি নারী কর্মতর রয়েছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন সর্বাধিক নারীকর্মী। এ সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। ২০১৮-এর প্রথম পাঁচ মাসে গড়ে প্রায় ২০০ জন সৌদি প্রবাসী গৃহকর্মী তাদের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দেশে ফিরে আসছিলেন

২০১৮ সালে বাংলাদেশের শ্রম খাতের একটি বড় ঘটনা ছিল সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য থেকে নারী গৃহকর্মীদের ব্যাপক হারে ফিরে আসা। বেসরকারি সংস্থা ব্রাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুর হাসান মে মাসে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, ২০১৮-এর প্রথম পাঁচ মাসে গড়ে প্রায় ২০০ জন সৌদি প্রবাসী গৃহকর্মী তাদের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দেশে ফিরে আসছিলেন। ২০১৮-এর ১২ দৈনিক জুন প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনেও দেখা যায়– বছরের প্রথম ছয় মাসে মেয়াদ শেষের আগেই দেশে ফিরে এসেছেন প্রায় এক হাজার নারী।

দেশে ফিরে এই শ্রমিকরা নানান ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ করছিলেন। বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এইরূপ একজন শ্রমিক সুনামগঞ্জের তাসলিমা আক্তার জানান, 'অনেক আশা নিয়ে ওই দেশে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তেমন কিছু না। দালাল বলেছিল সেখানে গেলে ২০ হাজার টাকা দেবে, মোবাইল দেবে, কথা বলতে দেবে, কাপড় চোপড়–সাবান তেল সবকিছু ফ্রি। 'কিন্তু আসলে তেমন কিছু না, ঠিকমত বেতন দেয় না, নিজের গাঁট থেকে টাকা দিয়ে সবকিছু কিনতে হয়।'

তাসলিমা আক্তার বলছিলেন, 'আমার প্রায় আট মাসের বেতন বাকি। বেতন চাইলে বলে তোর আকামা হয় নি, আকামা করাতে আড়াই লাখ টাকা লাগবে– এরকম অনেক কিছু বোঝাতো।'

অনুসন্ধানে দেখা যায়, অনেক সৌদি প্রবাসী নারী শ্রমিক এখন রিয়াদ ও জেদ্দায় সেফ হোমে অবস্থান করছে এবং দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সৌদি আরবে গৃহকর্মী যাওয়ার প্রক্রিয়াতে বর্তমানে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে লেনদেন। নিয়ম অনুযায়ী সৌদি নিয়োগকর্তা যখন তার দেশের রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে গৃহকর্মী চান তখন তিনিই সেই এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেন। সেই এজেন্সি তখন বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী শ্রমিককে কোন অর্থ দেয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। মধ্যস্বত্ত্বভোগী এজেন্সিগুলো আর্থিক মুনাফার জন্য শ্রমিকদের 'বিক্রি' করে দিচ্ছে। জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকাও আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে।

চুক্তি অনুযায়ী চাকুরির প্রথম তিন মাস শ্রমিকদের দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্সিকে বহন করার কথা। এরপর তাদের দায় দায়িত্ব থাকে না। অথচ অন্যান্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এজেন্সিগুলো প্রায় দুই বছর এইরূপ দায়দায়িত্বে থাকে।

যেহেতু তিন মাস পর গৃহশ্রমিকদের দায়-দায়িত্বে কেউ থাকে না– তখন মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এসময় কোন শ্রমিক দেশে আসতে চাইলে মালিক তার বিরুদ্ধে এজেন্সিকে তাঁর দেয়া টাকা ফেরত চেয়ে মামলা করার হুমকি দেন। এছাড়া এরূপ শ্রমিকদের বিরূপ পরিবেশে ভাষা সমস্যাতেও পড়তে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই অনেকে বিদেশে চলে যাচ্ছেন।

দেশে ফেরত আসা নারী শ্রমিকদের একটি বড় অংশের অভিযোগ যেসব বাড়িতে গৃহকর্মী পদে তাদের নিয়োগ

করা হয় সেগুলো প্রায়ই যৌথ পরিবার। ফলে সেখানে কাজের চাপ থাকে মাত্রাতিরিক্ত। গৃহকর্মী শ্রমিক তসলিমা আক্তার জানান, তিনি যে বাড়িতে কাজ পেয়েছিলেন সেখানে লোক ছিল ৪৫ জন। প্রায়ই তারা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হন সেখানে।

তবে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার বলছেন এটি সৌদি আরবে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সমস্যা। বাকি ৮০ শতাংশ নিরাপদেই আছেন বলে তিনি দাবি করেন।

২০১৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে চাকুরি নিয়ে যেসব শ্রমিক বিদেশে যাচ্ছেন তাদের অর্ধেকই সৌদি আরব যাচ্ছেন এবং যেহেতু এদের বড় এক অংশই নারী গৃহকর্মী– ফলে বড় এই শ্রমবাজার রক্ষা করতে নতুন প্রকল্প হিসেবে এই শ্রমিকদের যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচাতে হোস্টেলে থেকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে একটি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে।

দৈনিক মানবজমিন ২০১৭-এর ১৫ নভেম্বর সরকারি সূত্রের দেয়া তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, বর্তমানে বিদেশের মাটিতে সাড়ে ৬ লক্ষাধিকের বেশি বাংলাদেশি নারী কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন সর্বাধিক নারীকর্মী। এ সংখ্যা প্রায় দুই লাখ।

সরকারের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রবাসী নারী শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই সৌদি আরবে যান। যেমন ২০১৭ সালে প্রায় এক লাখ বিদেশগামী নারী শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৮৩ হাজার গিয়েছেন সৌদি আরবে।

প্রবাসে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীকর্মী রয়েছে জর্ডানে। এ সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজারের অধিক। তৃতীয় অবস্থানে সংযুক্ত আরব-আমিরাত। দেশটিতে গেছে ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি নারীকর্মী। এসব দেশের মধ্যে সৌদি আরবে নারীকর্মী নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বিএমইটির কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতিদিনই কোনো না কোনো নারীকর্মীর পক্ষে অভিযোগ নিয়ে আসছে পরিবারের সদস্যরা। কোনো কোনো দিন একাধিক পরিবারও আসছে। অভিযোগগুলো প্রায় একই ধরনের। গৃহকর্তার নির্যাতন, ধর্ষণ, ঠিকমতো খেতে না দেয়া, নিয়মিত বেতন না দেয়া, অতিরিক্ত কাজ করানো, মারধর করা। কোনো কোনো পরিবারের অভিযোগ- সৌদি আরবে যাওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট নারীর তারা খোঁজই পাচ্ছে না।

বিদেশ থেকে নির্যাতিত নারীকর্মীরা কী অবস্থায় দেশে আসছে এবং এসে কী পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে তার বিস্তারিত অনেক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে দৈনিক প্রথম আলোতে ২০১৮-এর ১২ জুন এক প্রতিবেদনে। সেখানে একটি দৃষ্টান্তে বলা হয়:

লেবানন থেকে প্রায় এক বছর আগে দেশে ফেরেন ২৫ বছর বয়সী এক নারী গৃহকর্মী। তাঁর কোলে ছিল ১ মাস ১০ দিন বয়সী শিশু। তিনি যেখানে কাজ করতেন, ওই বাসার গৃহকর্তা শিশুটির বাবা। এই নারী জানান, লেবাননে যাওয়ার পর থেকে গৃহকর্তা তাঁকে যৌন নির্যাতন করতে থাকেন। ওই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে অভিযোগ করলেও তিনি এটি বিশ্বাস করেননি। পরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে উল্টো মামলা দিয়ে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর তাঁকে দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নেওয়া হয় বেসরকারি সংস্থা অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচির (ওকাপ) নিরাপদ আবাসে। সেখানে টানা কয়েক মাস ছিলেন তিনি। সংস্থাটি চিকিৎসার পাশাপাশি এই নারীকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাউন্সিলিংসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। তিনি লেবানন থেকে প্রতি দুই মাস পরপর ২৪ হাজার করে টাকা পাঠাতেন। সেই টাকা নিতেন স্বামী। এই নারী বলেন, 'স্বামীই আমারে বিদেশ পাঠাইছিল, এহন স্বামী তাকাইয়্যাও দেহে না। বাপ-ভাইও চেনে না। বিদেশি বাচ্চা দেইখ্যা অন্যরা হাসে।'

১৬

পাথরভাঙ্গা শ্রমিক

সিলিকোসিসের অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলছে না

প্রথমে পাথরভাঙ্গা শ্রমখাতের বিকাশ ঘটে দেশের স্থল বন্দরগুলোর কাছে এবং পাথর উত্তোলনের স্থানগুলোতে উন্মুক্ত ভাবেই। এখন তা ক্রমে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিকরা কোন ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পোশাক না পরেই পাথর ভাঙ্গার কাজ করে যাচ্ছেন

বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম খাতগুলোর একটি এখন পাথর ভাঙ্গার কাজ। এই খাতের শ্রমিকরা যেসব সমস্যায় ভুগে থাকে তার একটি সিলিকোসিস রোগ। এই রোগ মারাত্মক এক পেশাগত ব্যাধি যার পরিণতি মৃত্যু।

প্রথমে শ্বাসকষ্টের মধ্যদিয়ে এই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে এবং পরে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের কাশিতে কফ হতে থাকে। ত্বকে সাদা সাদা ছোপ ছোপ দাগ সৃষ্টি হয়। চেহারায়ও বিকৃতি দেখা দেয়। মূলত পাথরের গুড়ো ধুলো নাকের মধ্যদিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করেই এই রোগের বিস্তার ঘটে। দেশে ভাঙ্গা পাথরের চাহিদা যত বাড়ছে এই কাজে যুক্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে এবং এই রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে। স্বল্প মজুরির দরিদ্র শ্রমিকরা রোগটি ধরা পড়ার পরও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারেন না অর্থাভাবে। ফলে সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

২০১২ সাল থেকে শ্রমিকদের এই সমস্যা নিয়ে প্রচারমাধ্যমে বিশেষ আলোকপাত করা হচ্ছে। কিন্তু গত প্রায় ছয় বছর যাবৎ নিয়মিত বিরতিতে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হলেও এ থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রানের জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি ২০১৮ সালেও।

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবাদ পাওয়া যায় লালমনিরহাট থেকে। সেখানে সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থেকে বুড়িমারী স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা পাথরভাঙা কারখানাগুলোয় সিলিকোসিসের প্রার্দুভাব সবচেয়ে বেশি। কেবল এ এলাকাতেই পাথর ভাঙা শ্রমিক রয়েছেন প্রায় ১২ হাজার। অনেক ক্ষেত্রেই এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাথর ভাঙ্গার কাজটি হচ্ছে। প্রায় এক শ' পাথর ভাঙ্গার কারখানা রয়েছে এখানে। ভাঙ্গার প্রক্রিয়ায় পাথর থেকে প্রচুর ধুলো উৎপন্ন হয়। কিছু কিছু কারখানা ধুলো কমাতে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করলেও অনেক কারখানাই সেসব অনুসরণ করছে না। এসব কারখানায় কাজের সময় পাথরের গুড়ো থেকে সিলিকা কণা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের দেহে প্রবেশ করছে। গত এক দশকে কেবল এখানে প্রায় ৬০ জন শ্রমিক সিলিকার দূষণজনিত রোগে মারা গেছে। এই রোগের শিকার শ্রমিকদের বিষয়ে দেশের কোথাও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। লালমনিরহাটে গত বছরও সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতাধিক ছিল বলে প্রচার মাধ্যম জানিয়েছে। পুরো জেলার বাতাসেই এইরূপ ধুলো-দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে।

শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার নিয়ে সক্রিয় বেসরকারি সংগঠন 'সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি' দীর্ঘদিন ধরে এই রোগের বিস্তার থেকে শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পাটগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে এই সংস্থা সিলিকোসিস সম্পর্কিত সতর্কতা ও চিকিৎসার লক্ষ্যে হেলথক্যাম্প করেছে। এই রোগে আহত-নিহত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তাও দিয়ে যাচ্ছে সেইফটি এন্ড রাইটস। ইতোমধ্যে এই সংস্থার সহায়তায় শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দায়ের করা রাজশাহীর শ্রম আদালতে প্রায় ৬৫টি ক্ষতিপূরণ বিষয়ক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। শ্রম আইনে একজন শ্রমিক এক নাগাড়ে কোন মালিকের অধীনে ছয় মাস কাজ করলেই সেই শ্রমিকের পেশাগত ব্যাধির চিকিৎসা করানো ঐ মালিকের জন্য বাধ্যবাধকতা রূপে রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসাকালে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজুরি

দেয়ারও বিধান রয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালেও এক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিপালন দেখা যায়নি।

প্রচার মাধ্যমের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রথমে এই পাথরভাঙ্গা শ্রমখাতের বিকাশ ঘটে দেশের স্থল বন্দরগুলোর কাছে এবং পাথর উত্তোলনের স্থানগুলোতে উন্মুক্ত ভাবেই। এখন তা ক্রমে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্রই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিকরা কোন ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পোশাক না পরেই পাথর ভাঙ্গার কাজ করে যাচ্ছেন।

বুড়িমারী স্থলবন্দরের আশেপাশের এলাকায় অনুসন্ধানে দেখা যায়, সেখানে ভুটান থেকে আমদানি করা জিপসাম স্টোন ও লাইম স্টোন ভাঙতে প্রায় ২০টি উন্মুক্ত কারাখানা গড়ে উঠেছে। প্রায় ৫-৬ হাজার শ্রমিক এসব কারখানায় পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে। এখানে দেখা গেছে, এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মালিকরা ভেঙ্গে পাথর আনার বিরোধী। তারা চাইছেন পাথরগুলো আমদানির পর ভাঙ্গা হোক।

পঞ্চগড়ের অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ। সেখানে পাথরের ধুলোবালি থেকে কেবল যে শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাই নয়– সাধারণ মানুষও আক্রান্ত। বাংলাবান্ধা জাতীয় সড়কের দুই পাশে উন্মুক্ত স্থানে এসব পাথর স্তুপ করে রাখা হচ্ছে এবং ভাঙ্গা হচ্ছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সামাজিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে এভাবে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানে পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি। সকাল থেকে সন্ধ্যা তারা কাজ করে। রাতে তারা মাথাব্যথা, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধাহীনতা ও নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন।

এ বিষয়ে তেতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. সুমন চন্দ্র রায় জানান, ইদানীং প্রচুর শ্রমিক ধূলোবালিবাহিত রোগ-বালাই নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হচ্ছেন। পাথর ভাঙা মেশিন থেকে উৎপন্ন পাথরের গুঁড়ো ও ধূলোবালি সরাসরি নিশ্বাস এবং নাক ও মুখের মাধ্যমে শ্রমিকদের শরীরে প্রবেশ করছে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর। এ কারণে শ্রমিকরা শ্বাসকষ্ট, কাশি, সর্দি এমনকি সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তিনি পাথর ভাঙা মেশিনে কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। শ্রমিকদের অনেকেই দীর্ঘদিন কাজ করার পর শ্বাসকষ্ট, সর্দিজ্বরসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হলেও মালিকদের পক্ষ থেকে কোনো সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় শ্রমিকরা।

শ্বাসকষ্ট ছাড়াও অন্যান্য দুর্ঘটনাও পাথর শ্রমিকদের অন্যতম সমস্যা হিসেবে অব্যাহত ছিল এবছর। বছরের শুরুতেই সিলেটে পাঁচ জন পাথর শ্রমিক এক দুর্ঘটনায় মারা যায় (কালের কণ্ঠ, ৪ জানুয়ারি)। স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ছাড়াও এ খাতে মজুরি সমস্যাও রয়েছে। আছে নারী-পুরুষ মজুরি পার্থক্য।

১৭

‘২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩২ হাজার প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা ছিল’

১৯৮১টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন

সাক্ষাৎকার

মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, ডিআইএফই, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিল্প নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্বের বছরের চেয়ে অগ্রগতি কতটা হলো ২০১৮-এ?

এবছর একটি কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ ছাড়া পোশাক খাতে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এটা আরএমজি সেক্টরে সফলতার একটা দিক। এছাড়া সামগ্রিকভাবেও দুর্ঘটনা কমেছে। পরিদর্শন বিভাগের নজরদারির সুফল এটা। নারায়ণগঞ্জে আরএমজি বহির্ভূত দুইটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে কয়েকজন শ্রমিক মারা গেছে। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ডগুলোতে ও নির্মাণাধীন ভবনে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। টঙ্গীর ন্যাশনাল ফ্যান কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় দুর্ঘটনা বলতে এগুলোই। আমাদের জনবলের মূল মনযোগ ছিল পোশাক খাতের দিকে। ফলে অন্যান্য খাতে কিছু দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে। কিন্তু আশার কথা হলো, আমাদের অধিদপ্তরের পরিদর্শন ব্যবস্থা একটা কাঠামোগত রূপ নিচ্ছে। ফলে আগামীতে দুর্ঘটনাপ্রবণ অন্যান্য খাতেও আমাদের মনযোগ বাড়বে। এ বছর যেকোন শিল্প দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য শ্রম আদালতে মৃত্যুজনিত মামলা হচ্ছে।

এ বছর অধিক দুর্ঘটনাপ্রবণ খাত ছিল কোনটা?

নির্মাণ খাত, জাহাজভাঙ্গা খাত ইত্যাদি। নির্মাণ খাতে আমাদের বিভাগের পরিদর্শন এখনও ব্যাপকভাবে শুরু করা যায়নি। জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ডগুলোতে নজরদারি থাকলেও সেখানে সমন্বয়জনিত কিছু জটিলতা আছে। এই খাতের দুর্ঘটনা রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আরও সম্পৃক্ততা দরকার। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ভাঙ্গার কাজ শুরু করার পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নেয়া আবশ্যক। কিন্তু সেখানে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিদর্শক মাত্র একজন। তাদেরও জনবল বাড়ানো দরকার। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে দায়িত্বে অবহেলার বিষয় রয়ে গেছে। সেজন্য দুর্ঘটনা কমার হার আশানুরূপ নয়।

শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে এ বছর আপনাদের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। তারপরও দুর্ঘটনা আরও কমছে না কেন?

২০১৩ সালে আমাদের পরিদর্শক ছিলেন ৯১ জন। ২০১৮ সালে হয়েছে প্রায় ৩১৫ জন। অর্থাৎ এটা সত্য, আমাদের জনবল বেড়েছে। তবে অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরও জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হলে আরও জনবল লাগবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমাদের ১০০টি পরিদর্শন টিমের পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২

হাজার প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এ বছর এই সংখ্যক প্রতিষ্ঠান একবার করে হলেও পরিদর্শন করার কথা। বর্তমানে পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রায় পোশাক খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন কত?

পরিসংখ্যান ব্যুরোর অর্থনৈতিক-শুমারি ২০১৩ এর হিসাব মতে, দেশে অর্থনৈতিক ইউনিট আছে ৭৮ দশমিক ১৮ লাখ। এর মধ্যে খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা ও মোটরযান মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩৬ লাখ, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ৫ দশমিক ২০ লাখ, উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৮ দশমিক ৬৮ লাখ। বছরে শুধু উৎপাদনমুখী ৮ দশমিক ৬৮ লাখ প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলেও প্রায় ২ হাজার ৭০০টি পরিদর্শক টিম প্রয়োজন, যা এ মুহূর্তে আমাদের নেই। ফলে সুষ্ঠু পরিদর্শনের স্বার্থে জনবল বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি।

অ্যাকর্ড/অ্যালায়েন্স কী আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এখনও তাদের আন্তরিক মনে হচ্ছে। ২০১৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার কথা। ইতোমধ্যে কিছু কারখানা আমাদের হাতে দিয়েছে তারা। আরও দেয়ার কথা হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে আমাদের পুরো বিষয় বুঝিয়ে দেয়ার।

অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সের কাজ আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন কী? বিদেশিরা ভরসা পাচ্ছে না কেন?

আমরা বলতে পারি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত। ৬০ জন প্রকৌশলী ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। আগে থেকেই ২৬ জন প্রকৌশলী ছিল। আইএলও একটা প্রকল্পের সূত্রে আমাদের ৫৪ জন জনবল সরবরাহ করবে। যার মধ্যে প্রকৌশলীর সংখ্যা ৪৭ জন। সব মিলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেয়ার কারিগরি সামর্থ্য গড়ে উঠেছে। আমি বলব আমরা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কাজ ধীরে ধীরে বুঝে নিতে সক্ষম। আমরা প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সকল আরএমজি কারখানা পরিদর্শন করার লক্ষ্য নিয়ে ভাবছি।

শিল্প মালিকরা পরিদর্শন বিভাগকে কতটা সহযোগিতা করে?

মালিকরা সহযোগিতা করেন ভালোই। ব্যবসা ধরে রাখতে তাদের সহযোগিতা না করে উপায়ও নেই। তবে ভাড়াকৃত ভবনে পরিচালিত কারখানাসমূহের মালিকদের সহযোগিতা থাকে কম।

কিছু কিছু খাতকে দুর্ঘটনাপ্রবণই দেখা যাচ্ছে– যেমন নির্মাণ, জাহাজভাঙ্গা ইত্যাদি। এটা কেন?

আমাদের অগ্রাধিকার হলো গার্মেন্টস সেক্টর। ফলে অন্য খাতগুলোতে নজরদারি কম পড়েছে। ধীরে ধীরে সেটাও অগ্রাধিকার পাবে। দুর্ঘটনা ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯৮১টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

[সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছে ৫ নভেম্বর ২০১৮]

১৮

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অর্থ আরও অধিক হারে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের দাবি

৩০০ কোটি টাকার অধিক জমা; ব্যয় হয়েছে ২৫ কোটি টাকা; যে হারে তহবিলের অংক বাড়ছে, সে হারে শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছিল শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রমজীবী মানুষদের কল্যাণে। এই ফাউন্ডেশনের অধীনে একটি তহবিল রয়েছে। যার নাম শ্রমিক কল্যাণ তহবিল। এই তহবিলসহ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কাজ পরিচালনার জন্য রয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন এবং সংশ্লিষ্ট একটি বিধিমালা।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিল-এর অর্থের উৎস হলো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত)-এর ২৩৪ (খ) ধারার বিধান মোতাবেক এক কোটি টাকার বেশি পেইড আপ ক্যাপিটাল সম্পন্ন কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বছর শেষ হওয়ার নয় মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে ফ্যাক্টরিভিত্তিক অংশগ্রহণ তহবিল, ফ্যাক্টরি কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে। অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান তার মোট লাভের ৫ শতাংশের এক দশমাংশ পরিমাণ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দিবে।

এই অর্থ শ্রমিকদের কল্যাণে নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করার কথা:

- কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
- উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক তিন লাখ টাকা প্রদান।
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীকালে মৃত্যুবরণ করলে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান।
- মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ হাজার টাকা প্রদান।
- জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ হাজার টাকা প্রদান।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ হাজার টাকা প্রদান।
- কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক এক লক্ষ টাকা প্রদান।

ইতোমধ্যে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো নিয়মিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে যাচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ। যেমন গ্রামীণ ফোন ২০১৩ সাল থেকে প্রতিবছর শ্রমিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এ তহবিলে দিয়ে আসছে। গত ৫ বছরে তারা এ তহবিলে ৯৪ কোটি ২ লাখ ৫৮ হাজার ৬৮ টাকা দিয়েছে। কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে (১৭ এপ্রিল ২০১৭) জানা যায়, ২০০৮ সালে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে যেখানে ছিল মাত্র আট লাখ ৪৪ হাজার টাকা– সেখানে ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। আর ২০১৮ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ১২২টি কোম্পানির কাছ থেকে এই তহবিল ৩০০ কোটি টাকার অধিক অর্থ পেয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ কোটি টাকার মতো। বাকিটা এফডিআর করে রাখা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, যে হারে তহবিলের অংক বাড়ছে, সে হারে শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না। ১৮ আগস্ট ২০১৭ প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৫ থেকে পরবর্তী তিন বছরে এই তহবিল থেকে এক হাজার ৪১৫ জন শ্রমিক ও তাদের স্বজনদের সহায়তা

হিসেবে দেয়া হয়েছে ১১ কোটি টাকা মাত্র। ২০১৮ সালের নভেম্বরের এক হিসাবে জানা যায়, এ পর্যন্ত শ্রমিকদের জন্য এ তহবিল থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে, এই তহবিলের অর্থ কোন ব্যাংকে এফডিআর করে রাখা হয়েছে সে বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলো কিছু জানে না। শ্রমিকদের কল্যাণে বিতরণ না করে কেন এই অর্থ জমা করে রাখা হয়েছে সে বিষয়ে মাঝে মাঝে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন তুললেও বিষয়টি পূর্বাবস্থাতেই রয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মতোই পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রয়েছে পৃথক তহবিল

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের আদলে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সহায়তা দিতে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য আরেকটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান এ তহবিলে তাদের রপ্তানি মূল্যের .০৩ শতাংশ অর্থ জমা করবে– এইরূপ নিয়ম করা হয়েছে। পোশাক খাতের সর্বমোট রপ্তানি হিসাবকে বিবেচনায় নিয়ে এ তহবিলে প্রতিবছর প্রায় ৭৫ কোটি টাকা জমা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। যা থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা আর্থিক সুবিধা পাবে। গত ২০১৬ সালের ১ জুলাই তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য চালু হয় এই কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল। কিন্তু প্রথম দুই বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এ তহবিলে কাংক্ষিত পরিমাণের চেয়ে ৩৩ শতাংশ কম অর্থ জমা পড়েছে। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পোশাক খাতের রপ্তানি ছিল ৫৮.৭৬ বিলিয়ন ডলার। এর .০৩ শতাংশ হিস্যা হয় টাকার অংকে ১৪৭.৬৮ কোটি টাকা। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের তহবিলে জমা পড়েছে এক শত কোটি টাকার মতো।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, কিছু ব্যাংক পোশাক কারখানাগুলোর রপ্তানি মূল্য থেকে নির্ধারিত অর্থ কর্তন না করায় তহবিলে অনুমিত হিসাবের চেয়ে প্রায় ৩৩ শতাংশ অর্থ কম জমা পড়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব গত ১৫ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে সচিব লেখেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের এলসি নগদায়নের সময় রপ্তানি মূল্যের দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে কাটার পর সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলের 'সিআরএমজি সেক্টর' নামক হিসাবে জমা হওয়ার কথা। সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিছু ব্যাংক রপ্তানি মূল্য থেকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কাটছে না। ফলে কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম অর্থ জমা পড়ছে। শ্রমিকের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ও তাদের মেধাবী সন্তানদের সহযোগিতায় তহবিলটি ব্যবহার হয় উল্লেখ করে চিঠিতে এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিশ্চিত করতে গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

> এ পর্যন্ত ১২২টি কোম্পানির কাছ থেকে এই তহবিল ৩০০ কোটি টাকার অধিক অর্থ পেয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ কোটি টাকার মতো। বাকিটা এফডিআর করে রাখা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, যে হারে তহবিলের অংক বাড়ছে, সে হারে শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে 'কিছু কিছু ব্যাংক রপ্তানি মূল্য থেকে নির্ধারিত অর্থ কর্তন করছে না'– উল্লেখ করে অনুমোদিত সব ব্যাংকের শাখাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, পোশাক খাতের কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ দুটি হিসাবের মাধ্যমে জমা হচ্ছে। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থ সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব এবং বাকি ৫০ শতাংশ আপতকালীন হিসাবে জমা হচ্ছে। কল্যাণ তহবিলের এ দুটি অংশের একটির মাধ্যমে শ্রমিকের বীমা পাওনা মেটাচ্ছেন কারখানা মালিকরা। আরেক অংশ থেকে শ্রমিকের চিকিৎসা ব্যয় বহন এবং শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে খরচ হচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এছাড়া পোশাক খাতের কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিলে ২০১৭ পর্যন্ত জমা পড়ে আছে ৯৬ কোটি টাকা। এই খাতের শ্রমিকদের নানান প্রয়োজন সত্ত্বেও এভাবে অর্থ জমিয়ে রাখার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এদিকে পোশাক শ্রমিকদের জন্য গড়ে তোলা এই তহবিলে অর্থের যোগান বাড়াতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) কারখানাগুলোকেও এ তহবিলের আওতায় আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে অন্য কারখানার মতো ইপিজেডের কারখানা থেকে পোশাক রপ্তানিতে অর্থ কর্তন শুরু হয়েছে।

১৯

সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের সমস্যার সুরাহা হয়নি; তবে নিহত ও অক্ষম জেলেদের জন্য প্রণোদনার উদ্যোগ

সমুদ্রগামী জেলেদের দাবিগুলো হলো, সাগরে নিরাপত্তা প্রদান; জলদস্যু-বনদস্যু ও ভারতীয় জেলেদের আগ্রাসন বন্ধ করা; মুক্তিপন ছাড়া ব্যবসা নিশ্চিত করা; র‍্যাব, কোস্টগার্ড, নৌ-বাহিনী, নৌ-পুলিশ ও বনবিভাগসহ সকল প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতা; গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য জেলেদের জিপিএস, ওয়ারলেস সেট ও ওয়াকিটকি প্রদান; দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বে সমুদ্রে মোবাইলের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কাজের জন্য লাইফ জ্যাকেট, বয়া ও কম্পাস প্রদান করতে হবে

গত এক দশকে বাংলাদেশ যেসব খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মৎস্য খাত। মৎস্য খাতের উন্নয়নে সমুদ্রগামী জেলেদের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাদের ভূমিকার মধ্যদিয়েই এখাতে এখন মাছ রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু এই জেলেরা বহুধরনের সংকটে জর্জরিত। ২০১৮ জুড়ে এই খাতের শ্রমিক ও মালিকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে প্রান্তিক বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল– যদিও জাতীয় পত্রপত্রিকায় তার কাভারেজ ছিল খুব কম। তবে পাশাপাশি সরকারও এমন একটি উদ্যোগ নিচ্ছে যাতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলদস্যুদের আক্রমণ কিংবা কোন হিংস্র পশুর আক্রমণে আহত-নিহত জেলে পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা দেয়া হবে। এই উদ্যোগ থেকে সমুদ্রগামী মৎসজীবীরাও লাভবান হবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে এইরূপ উদ্যোগ থেকে সুবিধা পেতে মৎস্যজীবীদের মৎস্য অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হতে হবে। ২০১৮-এর মাঝামাঝি এইরূপ নিবন্ধিত মৎসজীবীর সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ অতিক্রম করেছে। নিবন্ধিত জেলেদের পরিচয়পত্রও দেয়া হচ্ছে।

বাড়ছে মৎস খাতের পরিসর

বাংলাদেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষ এখন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের সঙ্গে যুক্ত। এইরূপ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীরা এক বিশাল অংশীদার। ইতোমধ্যে ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ প্রথম স্থানে রয়েছে। তবে এইরূপ সুখবরের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে সমুদ্রগামী জেলেদের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটি। বাংলাদেশের অন্যতম বিপজ্জনক পেশা সাগরে মাছ ধরা।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল দেশে ৫০ লক্ষাধিক মানুষ। সমুদ্রসীমা নিয়া ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় আরও প্রসারিত হয়েছে মৎস্য আহরণের সুযোগ। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগানোর মতো পরিবেশ নেই।

উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের একটি বড় অংশ বংশ পরম্পরায় মৎস্যজীবী নন। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক অভিঘাতের কারণে তারা নোনা জলে মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে। কিন্তু মাছ ধরার সাথে যুক্ত পেশাজীবীদের ব্যাপক মাত্রায় প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলদস্যুদের আক্রমণ তাদের নিত্য যন্ত্রণা। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। প্রায় সকলেই অতি দরিদ্র। পেশায় বিনিয়োগের মতো তাদের শারীরিক সামর্থ ও সাহস ছাড়া কিছুই নেই। মহাজনী শোষণ ও বিপণন চক্রের অসাধুতার ফলে প্রায় নিঃস্ব জীবন যাপনে বাধ্য এরা। রয়েছে নিজস্ব পুঁজির অভাব এবং সরঞ্জামের অভাব।

সামুদ্রিক মৎস্য আইন, মাছধরা যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক নৌযান পরিচালনা বিধি, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এই জেলেরা একদিকে যেমন সরকারি আইন, বিধি ও নীতিমালা লঙ্ঘন করেন, তেমনি সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাও তাদের নাগালের বাইরেই রয়েছে।

প্রতিদিন হাজার হাজার নৌযান মাছ ধরতে সাগরে যায়। এসব নৌযানে জীবন রক্ষাকারী বয়া, লাইফজ্যাকেট, রেডিও, দিকনির্ণায়ক যন্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি থাকে। উপকূলীয় এলাকার ট্রলারের ৯০ ভাগে বয়া ও লাইফজ্যাকেট এবং দিকনির্ণায়ক যন্ত্র থাকে না অনেক সময়। যার ফলে দুর্যোগের সময় প্রাণহাণী ঘটে বা দুর্ঘটনায় পতিত হতে হয়। কেবল বরগুনা জেলার ট্রলার মালিক সমিতির তথ্যানুযায়ী গত ২০ বছরে এই এলাকায় ট্রলার ডুবিতে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার জেলে মারা গেছেন। নিখোঁজ হয়েছেন কমপক্ষে ১০ হাজার। পুরো উপকূলীয় এলাকার হিসাব নিলে এই সংখ্যা যে অনেক বড় হবে তা বলাই বাহুল্য।

বিভিন্ন সময় সমুদ্রগামী জেলেরা বলেছে, তাদের প্রয়োজন সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ; আরও দরকার সাধারণ বীমা ও জীবন বীমায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সমুদ্রের আবহাওয়া সংবাদ জেলেদের কাছে পৌঁছানোর কার্যকারী উদ্যোগ গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তি ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি ব্যবহারে জেলেদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে সমুদ্রে মাছ ধরাকালীন জেলেদের নৌকার অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে দুর্যোগের সময়ে জেলেদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন ও মাছ ধরার সময়ে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

আরেকটি বড় দাবি, সমুদ্রসীমায় ভারতীয়দের নির্যাতন কমানো। বাংলাদেশী জলসীমায় ভারতীয় ট্রলারগুলো হামেশাই মাছ শিকার করে। বাংলাদেশী জেলেরা প্রতিবাদ করলেই তাদের মারধর করা হয় এবং ট্রলার ডুবিয়ে দেয়া হয়। ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশী জলসীমার ছোটবড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ অবৈধভাবে ধরার কারণে বিলুপ্ত প্রায় ঐসব জাতের মাছ। দেশীয় জেলেদের অভিযোগ, প্রতিবছর ইলিশের ভরা মৌসুমে এবং ইলিশ ধরায় বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া নিষেধাজ্ঞার সময় দেশের জলসীমার অন্তত ১১০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে অবাধে ইলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জেলেরা।

মিয়ানমারের জেলে এবং নৌবাহিনীর দ্বারাও বাংলাদেশের জেলেদের হয়রানির ঘটনা ঘটছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে কেবল এক দফাতে ১৯ জন বাংলাদেশীকে অপহরণ করে মিয়ানমারের কোস্টগার্ড। পরে চার লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে তারা ছাড়া পান।

এছাড়া সুন্দরবনকেন্দ্রিক স্বশস্ত্র জলদস্যু বাহিনীর নির্যাতন, অপহরণ এবং মুক্তিপন নিয়ে নিঃস্ব করে জেলেদের। এরও তাৎক্ষণিক প্রতিকার প্রয়োজন। এসব দাবিতে উপকূলীয় জেলা ও উপজেলাগুলোতে গত বছর বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন ও সমাবেশও হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলে জেলেদের অধিকার নিয়ে সক্রিয় একটি সংগঠন অ্যাওসেড এ বছর সরকারের কাছে সমুদ্রগামী জেলেদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ, সাধারণ বীমা ও জীবন বীমায় অন্তর্ভুক্ত করা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সমুদ্রের আবহাওয়া সংবাদ জেলেদের কাছে পৌঁছানোর কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করেছে।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ সমুদ্রগামী জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, মোট জিডিপিতে বর্তমানে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬১ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের হিস্যা ২৪.৪১ শতাংশ।

২০

বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধার তদন্ত চায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রম অধিকার সংগঠন

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মানবাধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা মেনে চলছে না এবং তারা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ নয়– এই অভিযোগ তুলে শ্রম অধিকার বিষয়ক সংগঠন দি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি), দ্য ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন (সিসিসি)সহ আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউরোপীয় ন্যায়পালের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে ২০১৮ সালে।

অভিযোগে তারা বলে, ইইউর জেনেরাইলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সের (জিএসপি) আওতায় বাংলাদেশ ইউরোপে রফতানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুল্ক ছাড় পায়। জিএসপির শর্তানুসারে উপকারভোগী দেশগুলোকে নির্দিষ্ট শ্রমমান মেনে চলতে এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত স্বল্পোন্নত দেশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জিএসপি বেশ শিথিল। অস্ত্র ছাড়া আর সবকিছুই বাংলাদেশ ইউরোপে রপ্তানি করতে পারে। এ ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পেয়েছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। অর্থাৎ ইউনিয়নভুক্ত সবকটি দেশেই বাংলাদেশ অস্ত্র ছাড়া সবকিছুই রপ্তানি করতে পারছে। মূলত ইইউ বাংলাদেশের মূল বাণিজ্য সহযোগী। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তৈরি পোশাক। আর এই খাতে ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশ প্রণালিবদ্ধভাবে গুরুতর মাত্রায় শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘণ করে আসছে বলে উপরোক্ত সংগঠনগুলোর অভিযোগ। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যমান শ্রম আইন শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারের পথে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রেও এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ত্রুটিপূর্ণ আইনও সরকার বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করে না। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অভিযোগ নিয়মিতভাবে উপেক্ষা করে। দরকষাকষির ক্ষমতা ও আইনী সহায়তা না পাওয়ায় শ্রমিকেরা চরম দারিদ্র্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে বলে এসব সংগঠন দাবি করেছে।

ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশ সরকারকে শ্রমপরিবেশ উন্নয়নের তাগাদা দিয়েছে। কিন্তু তারা বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা নিয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেনি। যদিও এই জিএসপি ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাতে বড় এক অস্ত্র, এটি দিয়ে সে নিশ্চিত করতে পারে– শ্রমিকেরা যেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাদ না পড়ে। এছাড়া কমিশন স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে, যা দিয়ে সে ঠিক করতে পারে, তদন্ত কখন শুরু করা যেতে পারে। সে কারণে এনজিওসহ অন্যদের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।

ইউনিয়নভুক্ত সবকটি দেশেই বাংলাদেশ অস্ত্র ছাড়া সবকিছুই রপ্তানি করতে পারছে। মূলত ইইউ বাংলাদেশের মূল বাণিজ্য সহযোগী। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তৈরি পোশাক। আর এই খাতে ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আইটিইউসির মহাসচিব শরন বারো বলেছেন, বাংলাদেশের সরকারকে শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাকে শুধু ক্ষমতাবান গার্মেন্টস মালিকদের কাছে নতজানু হলে চলবে না। তাদের অনেকেই মারাত্মক শ্রমশোষণ করে থাকেন। এই অভিযোগ উত্থাপনের লক্ষ্য হলো ইইউকে দিয়ে বাংলাদেশকে খুবই পরিষ্কার বার্তা দেয়া। ইইউ যে অঙ্গীকার করেছে তার আলোকেই তাদের এটি করতে হবে। সংস্থাগুলোর বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে ইউরোপের মানুষের পোশাক যারা বানায়, তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা ইউরোপীয় ইউনিয়নের দায়িত্ব।'

[সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন ২০১৮]

২১

রানাপ্লাজা ধসের পাঁচ বছর পূর্তি
তাজরীন অগ্নিকান্ডের ছয় বছর পূর্তি

মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয়নি; প্রাণে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের দুঃসহ জীবন

২০১৮ সালের এপ্রিলে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার ৫ বছর পূর্ণ হলো। সাভারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ঐ দুর্ঘটনায় ১ হাজার ১৩৬ জন শ্রমিক নিহত এবং দুই হাজারের বেশি শ্রমিক আহত হয়েছিল। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বরাবরই একে হত্যাকান্ড হিসেবে অভিহিত করে থাকে এবং কথিত 'দুর্ঘটনা'র জন্য দায়ীদের প্রচলিত আইনে বিচার দাবি করেছেন।

রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে সরকার ও বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংস্থার বহুমুখী উদ্যোগে পোশাক খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনি ও ভৌত অবকাঠামো এবং শ্রম কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় পোশাক খাতে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাড়তি সচেতনতা এসেছে বাংলাদেশ। প্রায় ২৮টি কারখানা আছে; যারা ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) পরিবেশগত মানের সনদ পেয়েছে। এর মধ্যে লিড সনদের সর্বোচ্চ মান প্লাটিনাম ছয়টি, গোল্ড ১৪টি, সিলভার পাঁচটি এবং তিনটি সার্টিফায়েড লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে একটি ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও কারখানা ১১০ নাম্বারের মধ্যে ৯০ নাম্বার পেয়েছে। এ ছাড়া শতাধিক গ্রিন কারখানার ইউএসজিবিসি সনদ রয়েছে। ইউরোপীয় বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড ও মার্কিন বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় শতভাগ কারখানায় জরিপ সম্পন্ন করেছে এবং জরিপ পরবর্তী রেমেডিয়েশনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। রানাপ্লাজার ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে উত্তর আমেরিকার পোশাক ক্রেতা ও সংস্থার জোট 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি'। এই জোটে আছে ওয়ালমার্ট, গ্যাপ, মেসি, ভিএফ, টার্গেট, জে সি পেনি, হাডসন বে, চিলড্রেনস প্লেস, কানাডিয়ান টায়ার করপোরেশন, এল এল বিনের মতো ২২টি নামি প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু রানাপ্লাজা ধসের পাঁচ বছর পূর্তিতেও দেখা যায়, প্রাণে বেঁচে যাওয়া আহত অনেক শ্রমিক এখনও দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, আহত শ্রমিকদের ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ এখনও কোনো কাজ করতে পারছেন না। ১২ শতাংশের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ২২ শতাংশ শ্রমিক এখনও মানসিকভাবে বিধ্বস্থ। ৫০ ভাগ শ্রমিক এখনও নানা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কারণে কাজ করতে পারছে না। এর আগে তারা বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে কিছু অনুদান পেলেও এর সিংহভাগই চলে গেছে চিকিৎসা ব্যয়ে। শ্রমিকদের অভিযোগ, তারা নামমাত্র সহায়তা পেলেও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পাননি।

> এসব মামলার দিকে নজর রাখছে বাংলাদেশের লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট। সংস্থাটির আইন শাখার উপপরিচালক মো. বরকত আলী জানিয়েছেন, এসব মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে কারো সাজার প্রশ্নও উঠেনি।

দুর্ঘটনার পর শারীরিক ও মানসিক কারণে তাদের অর্ধেকই এখন বেকার জীবনযাপন করছেন। অনুদান পেয়ে কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও বেশির ভাগই তাতে

সফল হতে পারেননি শারীরিক অসুস্থতার কারণে। এ শ্রমিকরা এখন শারীরিকভাবে দুর্বল এবং তাদের ভীতি এখনও কাটেনি। ১১০ জন শ্রমিক পুরোপুরি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে গেছেন। অর্থাভাবে এখন অন্য কিছু করা তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকুও করাতে পারছেন না। এ ভয়াবহ ঘটনার পাঁচ বছর পূর্তির কালেও তাদের পাশে শক্তভাবে কেউ দাঁড়াচ্ছে না।

আগে সভারের সিআরপি ও ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রানাপ্লাজার আহতদের ফ্রি চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যেত, যা এখন বন্ধ। কারণ সংশ্লিষ্ট 'ফান্ড' শেষ হয়ে গেছে। ফলে এখন তারা কোথাও আর ফ্রি চিকিৎসা পান না। অথচ তাদের আরও কয়েক বছর চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন। এখনও এদের অনেকেই সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে নানা রকম ভয়ভীতির মধ্যে আছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্য এদের এখনও ব্যক্তিগত বা গ্রুপ কাউন্সেলিং দরকার। এটা আজীবন সম্ভব না হলেও অন্তত আরও কয়েক বছর প্রয়োজন। অথচ এক এক করে সব প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা এখন এসব স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন না।

এদিকে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পর একে কেন্দ্র করে করা মামলাগুলোর একটি ছাড়া বাকি প্রায় কোনটিরই নিষ্পত্তি হয়নি। এ ঘটনার পর মামলা হয়েছে মোট ১৪টি। এর মধ্যে রয়েছে অবহেলা-জনিত মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশের মামলা, রাজউকের করা ইমারত নির্মাণ আইন লঙ্ঘন এবং নিহত একজন পোশাক শ্রমিকের স্ত্রীর দায়ের করা খুনের মামলা। মূলত ঘটনার পরেই সাভার থানা পুলিশ একটি মামলা করে। পরে একজন শ্রমিকের স্ত্রীও খুনের মামলা করলে দুটি মামলা একটিতে রূপ নেয় তদন্তের পর। অন্য আরেকটি মামলা হয়েছিল ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত। বাকী এগারটি মামলা করেছিলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

এসব মামলার দিকে নজর রাখছে বাংলাদেশের লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট। সংস্থাটির আইন শাখার উপপরিচালক মো. বরকত আলী জানিয়েছেন, এসব মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে কারো সাজার প্রশ্নও উঠেনি।

এদিকে ২০১৮ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরীন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনারও ছয় বছর পূর্তি হয়। দিনটি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। ২০১২ সালের এই দিনে তোবা গ্রুপের পোশাক কারখানা তাজরীন ফ্যাশনস-এর নিচ তলায় থাকা তুলার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১১৩ জন শ্রমিক মারা যান। আহত হন আরও তিন শতাধিক শ্রমিক।

এদিকে রানাপ্লাজার মতো তাজরীনের ঘটনারও কোন বিচার হয়নি ছয় বছর পরও।

ঘটনার পরদিন আশুলিয়া থানা পুলিশ অজ্ঞাতদের আসামি করে কারখানায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ এনে একটি মামলা করে। ঘটনার কয়েকদিন পর রেহানা নামে নিখোঁজ এক শ্রমিকের ভাই আবদুল মতিন ঢাকার নিম্ন আদালতে তাজরীন ফ্যাশনসের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে একটি নালিশি মামলা করেন। এসব মামলার এক বছর আটদিনের মাথায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ (এমডি) ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, কারখানা ভবনটি ইমারত নির্মাণ আইন মেনে করা হয়নি। শ্রমিকদের বের হওয়ার জন্য ভবনটিতে জরুরি বহির্গমন পথ ছিল না। আগুন লাগার পর শ্রমিকেরা বের হতে চাইলে কারাখানার ম্যানেজার শ্রমিকদের বাধা দিয়ে বলেন, আগুন লাগেনি। অগ্নি নির্বাপণের মহড়া চলছে। তিনি বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দেন। ফলে শ্রমিকেরা নিচে নামতে পারেননি। মালিকের অবহেলাজনিত হত্যা ও নরহত্যার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে বলে উল্লেখ করে আসামিদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩, ৩২৫, ৪৩৬, ৩০৪, ৩০৪-ক ও ৪২৭ ধারায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছয় বছর পার হলেও এখনও বিচার পায়নি নিহত ও আহতদের পরিবার। তাজরীন ফ্যাশনস কারখানায় অগ্নিকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও মালিকের শাস্তির দাবিতে তাজরীন দিবসের পূর্ব দিন ২৩ নভেম্বর মানববন্ধন করে গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন নামের একটি সংস্থা। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশন ও শ্রমিক নেতারা তাজরীন 'দুর্ঘটনা'র জন্য দায়ীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

২২

ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাড়লেও অনুমোদন প্রত্যাশা মতো বাড়ছে না

শ্রমিক সংখ্যার মাত্র চার ভাগের এক ভাগ ইউনিয়নভুক্ত

শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে চাইবে– এটা স্বাভাবিক। এটা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও বটে। সবচেয়ে বড় শিল্প খাত হিসেবে পোশাক খাতেই শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠনে বেশি উদ্যোগী হবে এও প্রত্যাশিত। তবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকায় পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাতিলের হার কিছুটা কমলেও চট্টগ্রামের চিত্র বিপরীত। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন বাতিলের হার বাড়ছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পক্ষ থেকে ২০১৮ সালে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে।

দেশের প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকা বাধ্যতামূলক। শ্রমিক প্রতিনিধিদের অভিযোগ, বিভিন্নরূপে প্রভাব খাটিয়ে চট্টগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম শক্তিশালী হতে দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য আবেদন করার পর তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে চট্টগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য ১৯টি আবেদন পড়ে। এর মধ্যে বাতিল হয় ১৫টি আবেদন। ২০১৬ সালে ৪০টি আবেদনের বিপরীতে বাতিল হয় প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০১৭ সালে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৩১। তাতেও অর্ধেকের বেশি বাতিল হয়ে যায়।

ঢাকায় ২০১৫ সালে পোশাক কারখানাগুলো থেকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য ২১৯টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে বাতিল হয় ৭৩ শতাংশ। ২০১৬ সালে মোট আবেদন জমা পড়ে ১০৭টি। বাতিল হয় ৩০ শতাংশ। ২০১৭ সালে ১৩৩টি আবেদনের ১৫ শতাংশ বাতিল হয়। জাতীয় দৈনিকগুলোর সংবাদে জানা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের

●

আরেকজন শ্রমিক সংগঠক নাজমা আক্তার বলেন, মালিকরা কখনই কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের চর্চা গড়ে উঠুক তা চান না। আর শ্রমিকদের তোড়জোড় দেখলে ছাঁটাইসহ নানা কৌশল অবলম্বন করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ ও প্রভাব খাটানোর ঘটনাও আমরা জানি। ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন বাতিলের বর্তমান ধারা মালিকদের অনীহারই প্রতিফলন।

আবেদন কেন এত বেশি হারে বাতিল হচ্ছে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের পরিচালক মো. গিয়াস উদ্দীন জানান, শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের জন্য কাজ করে। আমরা চাই ট্রেড ইউনিয়ন হোক। কিন্তু আবেদন অনুমোদন ও বাতিল দুটোই হয় শ্রম আইন অনুযায়ী। আইনের শর্ত পূরণ করতে না পারলে অথবা ভুলভ্রান্তি থাকলে আবেদন বাতিল হয়।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৮ হাজার ৪৬। পোশাক, চামড়াসহ বিভিন্ন খাতে ইউনিয়নগুলোর সদস্য সংখ্যা ২৮ লাখ ১৬ হাজার ৩৭৮। পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে মোট ৬৩২টি। চিংড়ি খাতে ১৬টি ও চামড়া খাতে ১৩টি।

শ্রম অধিদপ্তর সূত্র অনুযায়ী, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পর শিল্প

খাতে ইউনিয়নের আবেদন ও নিবন্ধন দুটোই বেড়েছে। বিশেষ করে পোশাক শিল্প খাতে অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন ও নিবন্ধন হয়েছে। ২০১৩ সালে ঢাকায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৪৩। এর মধ্যে নিবন্ধন পেয়েছে ৬৫টি। ২০১৪ সালে ৩৭৯টি আবেদনের বিপরীতে ১৫১টি ইউনিয়ন নিবন্ধন পায়। অন্যদিকে ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ট্রেড ইউনিয়ন আবেদন ছিল ২৭টি। এর মধ্যে অনুমোদন পায় ১৮টি। ২০১৪ সালে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৫১টি, যার ১৩টি অনুমোদন পায়।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলছেন, কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চর্চা নিয়ে সবসময়ই মালিকদের মধ্যে অনীহা কাজ করে। ট্রেড ইউনিয়নের তৎপরতা দেখলেই ছাঁটাইসহ নানা কৌশল ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে আবেদন বাতিল হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, অনেক সময় শ্রমিকদের অসচেতনতার কারণে আবেদনে ভুল থাকে। কিন্তু এ ভুল শোধরানোর পরামর্শ না দিয়ে এগুলো বাতিল করা হচ্ছে।

আরেকজন শ্রমিক সংগঠক নাজমা আক্তার বলেন, মালিকরা কখনই কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের চর্চা গড়ে উঠুক তা চান না। আর শ্রমিকদের তোড়জোড় দেখলে ছাঁটাইসহ নানা কৌশল অবলম্বন করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ ও প্রভাব খাটানোর ঘটনাও আমরা জানি। ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন বাতিলের বর্তমান ধারা মালিকদের অনীহারই প্রতিফলন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ৪১টি শিল্প খাত রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৫-১৬ অনুযায়ী, এসব শিল্প খাতে নিয়োজিত ১৫ বছরের বেশি বয়সী শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখের বেশি। এর মধ্যে শুধু পোশাক শিল্পেই কর্মরত ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক।

[ঈষৎ সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত; সৌজন্যে: বদরুল আলম, দৈনিক বণিকবার্তা, ৬ মার্চ ২০১৮]

২৩

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত চিত্র

প্রথম চিত্র

উচ্চশিক্ষিতদের বেকারত্বে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পার হয়নি এমন মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম (১ দশমিক ৮ শতাংশ)। প্রাথমিক পর্যায় শেষ করা মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। যারা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত, তাদের মধ্যে বেকার সাড়ে ৮ শতাংশ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ১০ দশমিক ৭ শতাংশ।

বাংলাদেশে তরুণ-তরুণীদের বেকারত্বের হার ২০১০ সাল পরবর্তী সাত বছরে দ্বিগুন হয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষাও এখন আর কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। তরুণরা যত বেশি পড়ালেখা করছে, তত বেশি বেকার থাকার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি।

২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আঞ্চলিক কর্মসংস্থান নিয়ে 'এশিয়া-প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক ২০১৮' শীর্ষক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটিতে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের ২৮টি দেশের বেকারত্ব, তরুণদের কর্মসংস্থান, নিষ্ক্রিয় তরুণের হার, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান, কর্মসন্তুষ্টি ইত্যাদির তুলনামূলক চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব ২০১০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ২০১৭ সালে ১২ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব ১০ দশমিক ৭ শতাংশ, যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল পাকিস্তান।

বাংলাদেশের তরুণদের বড় অংশ নিষ্ক্রিয়ও বটে। তাঁদের অনেকে কোনো ধরনের শিক্ষায় যুক্ত নন, প্রশিক্ষণ নিচ্ছে না, কাজও খুঁজছে না। দেশে এমন তরুণের হার ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ। মেয়েদের মধ্যে এই হার বেশি, ৪৫ শতাংশের কাছাকাছি। পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা আশাবাদী নন বলেই তারা নিষ্ক্রিয়– এমনই আভাস মিলে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইএলওর সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তা বাড়তি হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আবার তরুণদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা কর্মসংস্থানে কাজে লাগছে কি না, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।'

আইএলও অনুযায়ী, সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলেই একজন ব্যক্তি আর বেকারের তালিকায় থাকেন না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে বেকার ছিল ২৬ লাখ ৭৭ হাজার; যা আগের বছরের চেয়ে ৮৭ হাজার বেশি। ওই সময় কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে সাড়ে ৪০ হাজার তরুণ-তরুণী বেকার ছিলেন। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বেকার ছিলেন ৬ লাখ ৩৮ হাজার। আর দেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৫ লাখ।

অন্যদিকে ২০১৮ সালের মার্চে দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চস্তরে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ধারাবাহিকতা ক্রমে কমে যাচ্ছে। বিসিএস-এর চারটি নিয়োগ প্রক্রিয়া (৩৩-৩৬)-এর অনুসন্ধান শেষে দেখা যায় তাতে নারীদের নিযুক্তির হার ৩৬.২৬ থেকে কমে ২৬.২২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ একই সময়ে শিক্ষার সকল স্তরে নারীদেরও অংশগ্রহণ ও সফলতা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালেই এগোচ্ছিলো।

উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি

বাংলাদেশে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন পর্যায়ে বেকারত্বের হার কত, তাও তুলে ধরা হয়েছে উপরে উল্লিখিত প্রতিবেদনে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পার হয়নি এমন মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম (১ দশমিক ৮ শতাংশ)। প্রাথমিক পর্যায় শেষ করা মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। যারা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত, তাদের মধ্যে বেকার সাড়ে ৮ শতাংশ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ১০ দশমিক ৭ শতাংশ।

এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য শামসুল আলম বলেছেন, 'দেশের উচ্চশিক্ষিতরা যতক্ষণ পর্যন্ত মনমতো চাকরি না পায়, ততক্ষণ নিজে কর্মজীবী বলে স্বীকার করে না। কোচিংয়ে পড়ানো, অনলাইনে কাজ করা ইত্যাদিকে তারা কাজ গণ্য করে না। আমার মনে হয়, মোটামুটি ভালো শিক্ষার্থীরা কিছু না কিছু করে।' তিনি বলেন, 'আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বাজারমুখী করতে হবে। শিল্প খাতে যে ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী জনশক্তি তৈরি করতে হবে।'

আইএলওর উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাজে যুক্ত ৫৪ শতাংশ বাংলাদেশি মনে করে, তাদের যথাযথ হারে বেতন বা মজুরি দেওয়া হয় না। অবশ্য এটা অত্র অঞ্চলের সাধারণ চিত্র। এ বিষয়ে আইএলওর প্রতিবেদনের লেখক সারা এলডার বলেন, 'এই অঞ্চলে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে। তারপরও এটা খুবই হতাশাজনক, এখনো অনেক শ্রমিক শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে। আহত হওয়া, চাকরি হারানো, দুর্যোগ, ফসলহানি তাদের দারিদ্র্যসীমার নিচে টেনে নেওয়ার ঝুঁকিতে রেখে দিচ্ছে।'

[দৈনিক প্রথম আলো (১৮ নভেম্বর) থেকে ঈষৎ সম্পাদিত ও সংক্ষেপিত]

দ্বিতীয় চিত্র

জনসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে ঘাটতি: পোশাকসহ অনেক খাতে বিদেশ নির্ভরতা

দেশে কৃষিজাত পণ্যে সার্বিকভাবে ৭৬ শতাংশ দক্ষ কর্মীর সংকট রয়েছে এ মুহূর্তে। নির্মাণ খাতে ২ লাখ অভিজ্ঞ কর্মীর সংকট আছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে নার্সিং পেশায় ৯৬ হাজার এবং মেডিকেল টেকনিশিয়ান ৮২ হাজার কর্মী কম আছে। হসপিটালিটি ও পর্যটন খাতে আধা দক্ষ ৬২ হাজার, অদক্ষ ১ লাখ ২৬ হাজার এবং দক্ষ ৩৭ হাজার কর্মীর অভাব রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে এ মুহূর্তে পৌনে ২ লাখ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৮৮ হাজার, হালকা প্রকৌশল খাতে প্রায় ৩৬ শতাংশ দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে।

প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী বর্তমানে বহির্বিশ্বে কাজ করছে। আবার পাশাপাশি এমন সংবাদও গতবছর প্রচারমাধ্যমে

ঝড় তুলেছে, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রেমিট্যান্স নিচ্ছে ভারতের মতো দেশের নাগরিকরাও। মূলত দেশের মধ্যে সৃষ্ট দক্ষ জনবলের ঘাটতির কারণেই চীন, ভারত, শ্রী লঙ্কা প্রভৃতি দেশের বিপুল নাগরিক বাংলাদেশের কাজের বাজারে ক্রমে বড় আকারে জায়গা করে নিচ্ছে। এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বিমান যোগাযোগের কয়েক গুন বৃদ্ধির বড় এক রহস্য সেটাই।

২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর এক গোলটেবিল বৈঠকে একজন বক্তা জানান যে, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ১০ হাজার ফ্রিল্যান্সার চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে প্রাথমিকভাবে ৩৩ হাজার গ্র্যাজুয়েট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পর মাত্র ১৭ জন ওই পেশার জন্য নির্বাচিত হন।

বেসরকারি খাতের মালিকরা প্রায়ই বলছেন, বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যা থাকলেও কাজের বাজারের চাহিদা তা দিয়ে পূরণ হচ্ছে না। অর্থনীতির পরিসর ও গুণগত পরিবর্তনের কারণে আগামী দশ বছরে বাংলাদেশে কয়েক লাখ উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন বিভিন্ন খাতে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উপরোক্ত চাহিদার সর্বোচ্চ পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাংলাদেশ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। বাকিটা আসবে হয়তো চীন-ভারত-শ্রী লঙ্কা থেকে। এক্ষেত্রে সরকারের মতোই বেসরকারি খাতের যে দায়িত্ব ছিল সেটা পালিত হচ্ছে না। অর্থাৎ নেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ।

বাংলাদেশে দক্ষ বিদেশী কর্মীর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে এখন পোশাক খাতে। পোশাক খাত ও প্রযুক্তি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলার পরিবর্তে বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগকেই অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে। অনেক কারখানা মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও বিদেশ থেকে ভাড়া করছেন। অথচ বাংলাদেশের নবীন গ্রাজুয়েটদের কিছুদিন এসব স্তরে প্রশিক্ষকের অধীনে কাজের সুযোগ দিলেই এক্ষেত্রে বিপুল হারে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে গার্মেন্ট খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পুরুষ নুরুল কাদেরের দৃষ্টান্ত কেউ অনুসরণ করেছেন বলে দেখা যায় না। তিনি এ খাতের গোড়াপত্তন করতে যেয়ে কেবল যন্ত্রপাতিই আমদানি করেছিলেন– বিদেশ থেকে কর্মী আনেন নি। বরং প্রায় দেড় শত বাংলাদেশীকে তিনি বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যদিয়েই আজকের পোশাক খাতের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতও এক্ষেত্রে দূরদর্শী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এই খাতে প্রতিটি ব্যাংক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেই কর্মীবাহিনী গড়ে তুলেছে। ফলে এই খাতে বিদেশী মানব সম্পদ নির্ভরতা সামান্য। বাংলাদেশে ব্যাংকারদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনের একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি দিচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু গার্মেন্ট খাতে সেরূপ নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। মালিক সমাজের তেমন আগ্রহ সামান্যই ছিল।

পোশাক খাতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ খাতে বড় কোন বিনিয়োগ হয়নি। এই বিষয়ে আলোকপাত করে একজন প্রযুক্তিবিদ লিখেছেন: কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য বছরে মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হলে সেটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বছরে কমপক্ষে ১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করতো। এ বিষয়ে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান ২০১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোতে লিখেছেন:

মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মী প্রকৃতপক্ষে 'গাইতে গাইতে গায়েন' হয়ে ওঠেন। এ জন্য প্রথমত তাঁকে উচ্চতর পদে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, যেন তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন। এর জন্য তাঁকে নিয়োগকর্তার আস্থাও অর্জন করতে হয়। ঠিক এই জায়গাতেই আমরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়ালে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাবেন। কিন্তু যদি অনেক কর্মীর দক্ষতা বাড়ানো না যায়, তাহলে সংখ্যা স্বল্পতার সুযোগে এই বাজারে কর্মীদের চড়া মূল্য দিয়েই কিনতে হবে নিয়োগকর্তাকে। এই সমস্যার উত্তরণ ঘটানোর রাস্তা হলো বিপুলসংখ্যক কর্মীকে নিয়মিত পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া।

এদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের এক যৌথ সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, দেশে কৃষিজাত পণ্যে সার্বিকভাবে ৭৬ শতাংশ দক্ষ কর্মীর সংকট রয়েছে এ মুহূর্তে। এর মধ্যে পুরোপুরি দক্ষ কর্মীর সংকট হচ্ছে ৭৭ শতাংশ, আধা দক্ষ ৭৫ শতাংশ এবং অদক্ষ ৭৫ শতাংশ। নির্মাণ খাতে ২ লাখ অভিজ্ঞ কর্মীর সংকট রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে নার্সিং পেশায় ৯৬ হাজার এবং মেডিকেল টেকনিশিয়ান ৮২ হাজার কর্মী কম আছে। হসপিটালিটি ও পর্যটন খাতে আধা দক্ষ ৬২ হাজার, অদক্ষ ১ লাখ ২৬ হাজার এবং দক্ষ ৩৭ হাজার কর্মীর অভাব রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে এ মুহূর্তে পৌনে ২ লাখ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৮৮ হাজার, হালকা প্রকৌশল খাতে প্রায় ৩৬ শতাংশ দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে।

২৪

নির্মাণ খাতে এখনও শ্রমিকরা দু'জন 'মালিক'-এর জন্য খাটেন

একজন শ্রমিক মারা গেলে বা পঙ্গু হয়ে গেলে একটা পরিবার পথে বসে যায়। এই বাস্তবতায় এবং চিকিৎসা খরচের কথা চিন্তা করলে শ্রমখাতে ক্ষতিপূরণের বর্তমান অংক নগণ্য। শ্রমিক নেতারা ২০১৮ সালেও তাদের সকল ধরনের কর্মসূচিতে মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ অন্তত ১০ লাখ ও পঙ্গুত্বের জন্য সাড়ে ১২ লাখ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন

২০১৭ সালের মতোই ২০১৮ সালেও দেশের প্রধান এক দুর্ঘটনাপ্রবণ খাত হিসেবে চিহ্নিত ছিল নির্মাণ শিল্প। যদিও নির্মাণ খাত অর্থনীতির এক বড় অংশ– কিন্তু এই খাতে 'স্থায়ী শ্রমিক' সংখ্যা সামান্যই। কোম্পানিগুলো মূলত ঠিকাদারদের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ দেয়। আর শ্রমিকদের আয় থেকে এক অংশ নিয়মিতভাবে নিয়ে নেয় ঐ ঠিকাদাররা। কিন্তু দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে এই শ্রমিকদের দায়িত্ব নেয়ার মতো কেউ থাকে না সচরাচর।

বিশাল এই খাতে প্রায় চার মিলিয়ন শ্রমিক এখন। বলা হয় যে, বিপুল এই শ্রমিকরা সব সময় দুজন মালিকের জন্য খাটেন। একজন থাকে মূল মালিক, আরেকজন থাকে ঠিকাদার মালিক। দুর্ঘটনার আধিক্য ছাড়াও এই খাতে আছে মজুরির বঞ্চনা। উল্লেখ্য, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক। এ শ্রমিকদের একটি বড় অংশ কাজ করে নির্মাণ খাতে। ২০১৭ সালে এই খাতে ১৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান বলছে, ২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে এই খাতে নিহত হয়েছে ১ হাজার ৩৭৭ জন শ্রমিক। মালিকদের অবহেলা, শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব, শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া এবং আইনের দুর্বলতার কারণে নির্মাণ খাতে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আহত-নিহত বেশির ভাগ শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণও মেলে না। দুর্ঘটনার পরই ঠিকাদাররা লাপাত্তা হয়ে যায়। আর কর্মক্ষেত্রের মালিক সহজেই 'আমাদের শ্রমিক নয়' বলে দায়িত্ব এড়ান।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, শ্রমিক হতাহতের প্রধান

দুটি কারণ হচ্ছে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হওয়া এবং ওপর থেকে পড়ে যাওয়া। নির্মাণ সামগ্রীর আঘাত, গ্যাস বা ধোঁয়ায় দমবন্ধ হওয়া এবং আগুনে পুড়েও অনেকে হতাহত হন। নির্মাণ শ্রমিকরা পেশাগত নানা স্বাস্থ্য সমস্যায়ও ভোগেন। যেমন, শ্বাসকষ্ট, কানে কম শোনা ও বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ।

শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়োগকারীর। শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ছাড়া নিয়োগকারী কাউকে কাজে নিয়োগ করতে পারেন না। আইনে এমন বাধ্যবাধকতা থাকলেও রাজধানীর একাধিক নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, হেলমেট, গামবুট, নিরাপত্তা বেল্টসহ নিরাপত্তা উপকরণ ছাড়াই কাজ করছেন শ্রমিকেরা। একাধিক শ্রমিক বলেছেন, পেটের দায়ে তাঁরা কাজ করেন। যেকোনভাবে দিন শেষে মজুরি পাওয়াই তাঁদের কাছে মুখ্য। এ সম্পর্কে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের (ইনসাব) সাধারণ সম্পাদক

আবদুর রাজ্জাক বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রম আইনে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'শিল্প স্বাস্থ্য সেফটি কমিটি' গঠন করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকলেও তৃণমূল পর্যায়ে এই কমিটি নেই। ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা মালিকপক্ষকে চাপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইনসাবের তথ্য অনুযায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ৩৭ লাখ শ্রমিক।

সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, নির্মাণ খাতে হতাহতের ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে ওপর থেকে পড়ে গিয়ে বা মাথায় ইট পড়ে কিংবা কোন ভারী বস্তুর আঘাতে। শ্রমিকেরা নিরাপত্তা বেল্ট ও মাথায় হেলমেট ব্যবহার করলে হতাহতের ঘটনা অনেক কম হতো। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের অভাব ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের অসচেতনতাই দায়ী। দুর্ঘটনার জন্য কখনো ক্ষতিপূরণ পেলেও সেটা থাকে অপ্রতুল। চিকিৎসা ব্যয় মেটে না তাতে। শ্রমিক নেতারা বলেন, একজন শ্রমিক মারা গেলে বা পঙ্গু হয়ে গেলে একটা পরিবার পথে বসে যায়। সেই বাস্তবতায় এবং চিকিৎসা খরচের কথা চিন্তা করলে এই টাকা নগণ্য। শ্রমিকরা ২০১৮ সালেও তাদের সকল ধরনের কর্মসূচিতে নির্মাণ খাতে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ অন্তত ১০ লাখ ও পঙ্গুত্বের জন্য সাড়ে ১২ লাখ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রম অধিকার ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গ

২০১৮-এর বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ঘটনা জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রধান দুই দলের নেতৃত্বাধীন দুটি জোটের পক্ষ থেকে যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয় তাতে শ্রম অধিকার ও কর্মসংস্থান প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল। যেমন, আওয়ামী লীগ বলেছে তারা শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করবে। নারী শ্রমিকদের জন্য চার মাসের বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

এছাড়া গার্মেন্ট শ্রমিকসহ সকল হতদরিদ্র শ্রমিক এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় নানান পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং প্রথারও আশ্বাস দিয়েছে এই দল। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি সংখ্যক কর্মী প্রেরণ এবং প্রবাসীদের অর্থ লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়ার কথা বলেছে। এও অঙ্গীকার করা হয়েছে, প্রবাসীরা ফিরে এলে প্রয়োজনে তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ তাদের ইশতেহারে বিগত সময়ে ৪০টি খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণেরও দাবি করেছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন জোট বলেছে, তাদের লক্ষ্য হলো পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী ব্যতীত অন্যান্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা তুলে দেয়া। সরকারি চাকরিতে কোটা থাকবে শুধু অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য। এ ছাড়া আর কোনো কোটা রাখা হবে না। এছাড়া ত্রিশোর্ধ শিক্ষিত বেকারদের জন্য বেকার ভাতা চালু করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা পরীক্ষা করে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি কমিশন গঠন করার কথাও জানিয়েছে এই জোট। এছাড়া বলা হয়েছে আগামী তিন বছরের মধ্যে সব সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে। নন-গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থান হবে কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি বিপণন খাতে। দেশে কাজ করা ওয়ার্ক পারমিটবিহীন অবৈধ সকল বিদেশি নাগরিকদের চাকরি বন্ধ করারও অঙ্গীকার করা হয়। শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধদের জন্য ন্যূনতম ভাতা রেখে অবৈতনিক খন্ডকালীন কর্মসংস্থান করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

ইশতেহারে এই জোট দুই বছরের মধ্যে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার টাকা করার আশ্বাস দেয়। এছাড়া গার্মেন্টসসহ অন্যান্য সকল শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করার কথাও জানায় তারা। আশ্বাস দেয়া হয়েছে সকল খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে এবং গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুলভ মূল্যে রেশনিং চালু করা হবে। পুনর্বাসন ছাড়া শহরের বস্তিবাসী ও হকারদের উচ্ছেদ করা হবে না বলেও জানানো হয়। উল্লেখ করা হয় যে, স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে শ্রমিকরা মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়ামের মাধ্যমে সকল চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। কর্মজীবী নারীদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার কথাও বলা হয়।

এই জোটের আর তিনটি প্রতিশ্রুতি ছিল: গৃহকর্মীদের জন্য কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কল্যাণে নীতিমালা প্রণয়ন এবং সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা।

১৫

Brief of Labour Rights and Labour Economy in 2018

- Amendment in the labour laws
- New wage structure in the different important industrial sectors
- No tax on the expatriate workers' remittance
- Increased returning of women expatriate workers
- Increased industrial accident
- Lack of skilled workers
- Declaration of establishing three more labour courts

In 2018, positive attitude has been seen considering the international opinion regarding labour sector in Bangladesh. Amendment has been made in the labour laws giving importance to the recommendations of different international agencies. Such amendment has been approved in the cabinet meeting in October 2018. However, the labour leaders have termed them inadequate. In December, the government also has approved the draft of EPZ Labour Act in the cabinet meeting. But the labour leaders have informed that like the past, the government remains negative to the application for forming trade unions. However, rejection of application for trade unions in the RMG declined a bit in Dhaka but increased in Chattogram.

In 17 March 2018, the Daily Prothom Alo published a report citing Centre for Policy Dialogue that only 3% RMG factories have trade unions. Though many factories have Workers Participation Committee (WPC) but the representatives of WPC are not elected. This year Grameen Phone, Chevron and other multinational companies have dismissed many employees from their Bangladesh offices. The aggrieved workers undertook protest rally being deprived of proper remedy.

On the other hand, the reformation activities of Accord and Alliance, a pact of international buyers, have been allowed this year also despite the conservative attitude of a part of garment owners and policy makers.

Lack of initiative to enhance skill of human resource has been noticed this year also. As a result, dependency on overseas workers increased in many sectors including garment factories. A joint survey of Finance Ministry and Bangladesh Development Research Council has shown that the agriculture sector lacks overall 76% of skilled workers. The infrastructure sector lacks around 200,000 of experienced workers. ILO report shows that Bangladesh ranks 2nd among the 28 countries in the Asia-Pacific region regarding unemployment of higher educated people. Though the unemployment rate is less (1.8%) among the people who did not complete primary education but 10.7% unemployment found among the higher educated. On 9 May 2018, Centre for Policy Dialogue (CPD) shared a research data that around 800,000 employments for women reduced in the industrial sector in the last four years. It

New law for the ship breaking sector

The death flow has been continued in the ship-breaking yard in 2018 also. Till 2017, 181 workers died by different types of accident in the last 12 years. This year in January the first accident took place at Premium Trade Corporation and RA Shipyard in Sitakundu. Two workers died in these two accidents. It is noticeable that 12 workers died in the ship breaking yard by accident during the 1st three months of this year (The Daily Manabjamin, 5 April 2018)

However, an Act on ship breaking sector has been adopted in the parliament this year. According to the 'Bangladesh Ship Recycling Bill 2018', all the workers in sector must have been taken under the protection of life insurance. The employers must have to ensure that. The act also termed it to a punitive offence if any ship is brought in the coast without the NOC of the relevant ministries. The act also includes that within the coming three years the government will adopt a separate Act regarding the waste management produced from the ship breaking. It is to be mentioned that, one fourth of the old ships of the world scrapped in Bangladesh.

The workers of ship breaking industry often complain that most of the employers show negligence in providing safety equipments in their workplace. Helmet, safety jacket, boots should be used in the yard as safety tools; however, it is not in practice. According to Yard Labour-Workers Federation, at first the ship importer delivers the ship breaking work to a contractor. The yard owner gives timeline to complete the ship breaking. The contractor puts pressure on the workers to complete the job. The uses of safety equipment often make the work slow. For this reason, the contractor inspires the workers not to use safety gears. Though the safety equipments are found available in most of the yards but it is not used in work. According to the law, the contractors for the ship breaking activities have to get permission from the government but in reality majority of them do not have valid approval from the government.

was 3,990,000 in 2013 and 3,100,000 in the 2016-17 fiscal year. But in the same time the participation of women workers increased in the agriculture and service sectors.

New wage structure in the different sectors including RMG

This year no big labour movement has taken place other than the movement for wage increment of RMG workers. Oppression on labour organizers was also significantly low. Though the RMG workers' organizations conducted movements demanding 16,000 taka as minimum wage but it was not met. But in October a new wage structure has been declared for the RMG sector though the wage board was declared in January. The workers did not agree to the wage structure and continued their movement. However, their movement did not get momentum as the schedule of parliament election declared.

Though the wage of RMG workers has not

been increased as expected, however, 10% growth has been recorded in the export of this sector. 9.11% growth has been made in the 1st nine months export of 2017-18 fiscal year which was higher than the same period of the previous year. However, like the past, the allegation of depriving the workers from getting festival bonus before the big festival of Eid was heard this year too. Moreover, allegation also heard that many factories paid the festival bonus which was not to the equivalent of the basic salary as per the law.

Proposal for new wage structure has been taken for the tea, leather, bakery, aluminium and few other sectors. Disappointment over wage structure also found among the tea workers like the RMG sector. Delay in paying outstanding salary is very common there. In fact, 'actual wages' get reduced through such practice. Lack of capacity among tea labour unions in realizing their right wages was also clearly identified. Their demand was 230 taka as daily wage but they get 102 taka.

Manusher Jonno Foundation published a survey report in March 2018 which found 72% RMG workers have not any appointment letter. Plights of leather industry workers, the 2nd largest export industry after RMG, still continued due to shifting of the industry to new place.

Accident prone road communication: New laws

Road safety remains the top of the citizens' talk throughout the year. Significant increase of casualty by road accident and suppression by the transport workers were continued.

Government took initiative to enact law aiming increased accountability of transport workers with a view to curb road accident. The cabinet approved the draft of Road Transport Act 2018 which includes maximum 5 years imprisonment and 500,000 taka financial penalty which was adopted in the parliament. According to the new Act if anybody dies or get injured by neglecting or reckless driving of vehicles the case will be filed under the section 304(Kha) of penal code.

Under this Act the accused will receive maximum 5 years imprisonment or financial penalty or both and maximum 500,000 taka financial penalty. But if any death by road accident proved as 'murder' through investigation then capital punishment under the criminal law will be applicable. The transport workers remained agitated against this Act. Difference of opinions between public and transport workers has been noticed regarding road safety issues. Some of the demands of the transport workers were -all cases of road accident must be bailable, annulment of the punishment of 500,000 taka penalty, reduce the educational qualification from 8th grade to 5th grade in getting driving license, inclusion of worker representative in the investigation of road accident cases under section 302, ending police harassment etc. The transport workers also organized gathering in different times this year to stop illegal toll on the highway but failed to draw public support.

Industrial accident on the rise

Industrial accident has been increased this year compare to the previous year. However, accident in the RMG has been decreased than the past. However, incidence of accident continued in the ship breaking industry, construction sector etc. as the past year. In the construction sector, no positive impact of labour laws has been seen regarding accident and also in the relation between owners and labours. Like 2017, construction industry remains the highest accident prone sector in 2018. In the 1steleventh months of 2018, around 570 workers died by accident at their workplace, which is higher than the accident occurred in the same period of 2017. The majority of workers died in the construction and on the road.

Five years has been passed after the incidence of Rana Plaza collapse, however, no cases has been resolved yet relating to this mishap. Likewise, perpetrators of Tazrin Factory incidence could not be brought under punishment.

Attack on journalists was also continued all the year round. The member of different press club often organized human chain against such attack. In January 2018, ninth wage board was formed to increase wage of the staff of newspaper and media agencies. In September 2017, after seven months, wage board recommended 45% of basic salary as especial allowance for the staff of newspaper and media agencies which is turned into effect since 1 march 2018.

Returning of expatriate workers on the rise

Being harassed in the overseas, returning of expat workers, especially women workers has been increased over the year. According to BRAC, there are 735,000 women working in different countries. Among them one third are employed in Saudi Arabia. Majority of them returned from there facing harassment. During the declaration of national budget it was circulated widely in the media that VAT would be imposed to the remittance of expat workers, however, government did not take any initiative for that at all.

On the other hand, media also published that the employment of foreign national has been increasing in our labour market. In 4 February 2018, Minister for Home Affairs informed the Parliament that around 85,486 foreign national from 44 countries are working legally in Bangladesh in different sectors. They are working at least 16 categories in 33 organizations.

Uniform pension scheme did not come to light

Uniform pension scheme did come to light in 2018 also. However, honourable Prime Minster informed the parliament that the government is working on it. In the light of her information it is expected that government will take initiative to increase coverage of uniform pension scheme in different private sectors.

This year such news was also published that

More than 55,000 female workers went abroad in 12 months

In 18 June 2018, Mr. Nurul Islam, honourable Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, informed the parliament that 55,149 female went abroad in the last 12 months as workers. In the same time 269 female workers returned facing various problems. He shared the information as a reply to the queries of Mr. Selim Uddin MP.

In response to another query of Nizam Uddin Hazari, MP, the honourable Minister shared that 5,035 Bangladeshi workers have been arrested in abroad and imprisoned. Among them 976 are imprisoned in Saudi Arabia, 851 in United Arab Emirates (UAE), 478 in Oman, 85 in Jordan, 29 in Libya, 5 in Thailand, 6 in Mauritius, 87 in Singapore, 27 in Japan, 137 in Italy, 91 in Hong Kong, 23 in South Korea, 97 in Iraq, 384 in Kuwait, 146 in Greece, 438 in Bahrain, 10 in Brunei, 113 in Maldives, 4 in Egypt and 238 in Qatar.

Accidental Death toll is on the rise

At least 570 workers died in 462 workplace accidents from January to November of 2018 according to the data derived from monitoring 15 national and 11 local newspapers, by Safety and Rights Society.

The highest number of deaths by accident is recorded in the construction sector, which is about 32% (180) of total deaths. Till November, 2018, the newspaper published at least 146 incidences of accident in this sector.

The majority of the dead workers were of below 30 of ages. Around 38% of them were belonging to this age group while 12 were female workers. In May 2018, the highest number (109) of workers has been died in accident. Sylhet, Dhaka and Narayanganj districts ranked the top in this regard.

The statistics shows that the number of casualty is much higher than the same period of the previous year. It was recorded that 405 workers died by accident during the 1st eleven months of 2017. On the other hand 383 workers died in 2016 while 373 died in 2015.

The above data has been collected from the selected newspapers only. The actual statistics of deaths and injuries by accident across the country must be higher than this.

government is preparing a policy to assist the fishermen's family if any member of them get injured or died by wild animals, pirates or disaster.

Issue of labour rights and employment in the election manifesto

In 2018, the most important event in Bangladesh is the national election undoubtedly. There were important commitment from the two alliances led by two major political parties in their election manifesto regarding labour rights and employment.

Awami league has committed that they would protect the fundamental rights of the industrial workers. They will implement 4 months maternity leave for the female workers with full salary.

Besides, they also have assured to initiate rationing for the low paid workers and rural landless agricultural workers including RMG workers. In regard to employment at overseas, they have committed to send more workers to abroad as well as to create opportunity to invest their remittance in a profitable way. They also have assured that expat workers will be given loan under flexible condition if they return.

The alliance led by BNP has said that their aim is to pull out the age limit to enter in the government job except in the police and defence force. The quota will exist only for the underprivileged community and persons with disability. There will be no quota other than that.

The alliance has assured to set taka 12,000 as minimum wage for the RMG workers within two years of their government. Besides, they will construct multi-storeyed buildings in the industrial area including garment industries

for the housing of workers. They also have committed to provide ration to the workers, agricultural workers and urban poor in fare price. They will not evict hawkers and slum dwellers without proper rehabilitation. They have also mentioned in their manifesto that the workers will enjoy health services through a specific amount of premium monthly under health insurance. They have also committed to establish adequate day care centre for the working mother.

The other three more commitment of this alliance are– to ensure workplace safety for the domestic workers, policy formulation for the welfare of informal sector labours and to ensure right to engage in trade unions in all sector.

17, 000 cases are pending for resolution in the Labour Courts and Appellate Tribunal

In the mid-August (26 August), the Government has declared to establish three more labour courts. These labour courts will be established in Barisal, Rangpur and Sylhet city. The decision was taken in the secretarial meeting of the government.

Before this there were seven labour courts in the country. Among them three are in Dhaka, two in Chattogram and one is in Khulna and Rajshahi respectively. There is a Labour Appeal Tribunal in Dhaka to address the cases resolved in the labour court. After the secretarial meeting, Ms Afroza Khan, Secretary, Ministry of Labour and Employment, shared with the media that 42 personnel will be employed for three labour courts including a chairman for each.

It is to be mentioned that there is no labour court in four divisional towns even after the five decades of the independence and only one appeal tribunal exists. Around 17,000 cases are pending for resolution in the labour courts and appellate tribunal (till March 2018).

Approval of EPZ Labour Act (draft)

The cabinet approved the EPZ Labour Act (draft) on 3 December 2018. In the past, 30% of the workers' representation was required to form a Labour Welfare Association in the EPZ. Now it is reduced to 20%. . The obligation of one fourth workers' support in regard to labour strike also has been relaxed.

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা), ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org